বুদ্ধিজীবী সমীপেষু

শিবপ্রসাদ রায়

বুদ্ধিজীবী সমীপেষু

শিবপ্রসাদ রায়

তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

।। বুদ্ধিজীবী সমীপেষু ।।

অমারাত্রির অন্ধকারের পর ভারতে যথার্থ জাতীয়তাবোধের সূর্য্যোদয় এখন সুনিশ্চিত। দেশের মানুষ আনন্দিত চিত্তে এই উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন। জাতীয়তাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই জাগরণকে অন্যায় অযৌক্তিক এবং হীনভাবে প্রতিরোধ করতে গিয়ে অর্জ্জন করে চলেছে ক্রমবর্দ্ধমান জন-ঘৃণা। দৃশ্যমান ঘটনাসমূহ দেশের পটপরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে দিচ্ছে। জাতির মসৃণ অগ্রগমনে বাধা তথাকথিত বুদ্ধি জীবী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে পড়ে সাহিত্যিক সাংবাদিক শিক্ষাবিদ কবি নাট্যকার অভিনেতা অভিনেত্রী সঙ্গীতশিল্পী চিত্রপরিচালক প্রভৃতি। এদের প্রতিভা ওলবৎ অর্থাৎ বিভিন্নমুখী। জগতের সব বিষয়ে এদের মতামত প্রদানের অধিকার আছে। সে বিষয়ে তার জ্ঞানগম্যি যাই হোক, জনপ্রিয় হলেই সে বুদ্ধিজীবী। প্রচারের মাধ্যমগুলো এদের নাম জনগণের সামনে এনে দেয়।

ভ্রমবশতঃ মানুষ এদের অপেক্ষাকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ধরে নিয়ে বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেয়। তারা তলিয়ে দেখে না যে, এইসব বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ অবদানটাই মূলত প্রমোদ। মদ বিক্রেতা কিংবা আম্রপালীদের মতো জন মনোরঞ্জনই এদের কাজ। এদের সামাজিক প্রভাব থাকলে অথবা এদের সৃষ্টিতে কল্যাণবুদ্ধি থাকলে সমাজ এতো নীতিহীন চরিত্রভ্রষ্ট হয় কি করে? এসব বাদ দিলেও 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি মোটেই সম্মানজনক নয়। বুদ্ধি বিক্রয় করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সরল অর্থে তারাই বুদ্ধিজীবী। তাহলে শ্রমজীবী বা দেহোপজীবিনীদের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবীরা পৃথক বা উন্নত হয় কি করে? সকলেরই

তো লক্ষ্য এক—জীবিকা নির্বাহ। সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতির তালিকায় কাদের নাম থাকে তা দেখলেই তো বোঝা যায়। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অপর্ণা সেন, সাবানা আজমী। এঁরা এক একটা জোরালো প্রচার মাধ্যমে প্রমোদ বিতরক মাত্র। অনেকের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনার অযোগ্য। প্রকৃত বিদ্বান মানুষের কাছে এরা চিরকাল অবজ্ঞেয় ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এঁদের ভূমিকা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যেও এইসব মৌলিক প্রশ্ন জাগিয়ে দিচ্ছে। মূলতঃ লর্ড মেকলের এরা মানস সন্তান। বাবু প্রজন্মের উত্তরসূরী। পরগাছা হয়েও এরা গাছের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল ইঙ্গ কালচারের কল্যাণে। এঁরা বিচিত্রবুদ্ধি, বাক্যে অজেয়। পরভাষা পারদর্শী এবং মাতৃভাষা বিরোধী। এরা দোলাচল চিত্ত আত্মপ্রত্যয়হীন স্বদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। উদার হিন্দুধর্ম এদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিকর দর্শন।

জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিভেদ সৃষ্টির জন্য অলীক বিকৃত মিথ্যা তথ্য পরিবেশন এদের নিত্যকর্ম। যেহেতু এইসব বুদ্ধি জীবীদের হাতের কাছে দৈনিক সংবাদপত্র। পল্লবগ্রাহিতা এদের কাছে পাণ্ডিত্য। এই পাণ্ডিত্য একসময় ছিলেন সোভিয়েটের কর্তাভজা। সমাজতন্ত্রের নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক। এখন ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অগ্রবর্তী বাহিনী। কর্তাভজা ঠিকই রয়ে গেলেন। শুধু পাল্টে গেল পীঠস্থান। ছিল মস্কো হলো মক্কা। ভারতে এদের স্কুলিং হচ্ছে জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি আর আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়। বিপানচন্দ্র, রোমিলা থাপার, এরফান হাবিবেরা এদের থিংকট্যাংক। ভারতের নিজস্বতাকে বিধ্বস্ত করা এবং ইসলামের সব আক্রমণকে আড়াল করার দায়দায়িত্ব এই তথাকথিত বুদ্ধি জীবীদের। পঞ্চমবাহিনীর মতো প্রচারের দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা নির্মাণ এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটা ঘৃণ্য মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এরা ডিভোটেড।

এদের বিচারবুদ্ধিতে মুসলীম মৌলবাদ বলে আদৌ কোনো কিছু ছিল না এবং নেই। ভারতে এবং বিশ্বের দেশে দেশে মুসলীম সমাজে যে উগ্র সাম্প্রদায়িক আগ্রাসী মনোভাব দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে হিন্দু মৌলবাদের প্রতিক্রিয়া। "যতদিন না পৃথিবীতে আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন পৌত্তলিকদের হত্যা করতে থাকো।" ইসলামের এই অমোঘ বাণীটিও বোধহয় এদের দৃষ্টিতে হিন্দু মৌলবাদ বা বাবরী মসজিদ ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধিজীবীদের রসনেন্দ্রিয় পরজাতি নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতুতে পবিত্র, তাই তাদের কাছে এই উক্তিই আকাঙিক্ষত। একটি বিতর্কিত সৌধ ভাঙার কারণে দেশের বুদ্ধিজীবীরা লাইন দিয়ে কাঁদলেন। নিত্য নতুন বিবৃতিতে একমাস কণ্টকিত করে রাখলেন সংবাদপত্রগুলিকে। সেকথা স্মরণ করে এখনও তাদের আনমনে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। দেশে এত বুদ্ধিজীবী আছে, বাবরী মসজিদ চূর্ণ না হলে লোকে জানতেও পারত না। কিন্তু মুসলিম পরিকল্পনায় ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিস্ফোরণ ঘটানো হলে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এবং সহস্র মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হলে একজন বুদ্ধিজীবীও সরব হন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করতে হবে দেশের মানুষকে। সামান্য সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ভারতে ইসলাম যে বেপরোয়া মারমুখী তার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক দলগুলির মোল্লাতন্ত্রকে নির্বিচার মদত এবং বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট রচনায় মুসলীম মৌলবাদকে চূড়ান্ত প্রোৎসাহন। এ সত্য প্রমাণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। যে-কোনো দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ যে-কোনো সাময়িকীর ফিচার ছোট গল্প যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল একটু সচেতন হয়ে লক্ষ্য করলেই সব বোঝা যায়। বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রটি কোন্ খাতে বইছে। মনে হবে, ভারতে হিন্দু নামে একটি অপরাধী জাতি বাস করে। অপরাধমুক্ত ভারতবর্ষ নির্মাণের জন্য তাদের সংগ্রাম হিন্দুত্ব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে। হিন্দুর কোনো ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই, তার নিজস্ব

কোনো কালচার নেই। যা আছে তা একটা কম্পোজিট কালচার। কমপ্লিট কালচার নয়। এটাই তাদের থিসিস।

বুদ্ধিজীবীরা জানে না, কিন্তু দেশের বিদ্বান পণ্ডিত বিদেশের স্কলাররা জানেন, হিন্দু সংস্কৃতি একটা পূর্ণ সংস্কৃতি। যার দ্বারা মানুষ পূর্ণতায় পৌঁছোতে চেয়েছে। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা বলেন, হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমানদের উৎসাদন অব্রাহ্মণদের নিপীড়ন হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্রের লক্ষ্য। কি অপূর্ব সরলীকরণ। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা নিমকের মান রাখতে জানে। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও বিদেশের প্রতি আনুগত্য এদের প্রশ্নাতীত। বি.জে.পি. ভারতীয় রাষ্ট্রের কথা বলে। তবু তাদের হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তা রূপে প্রচার করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে এই সংবিধান ফেলে দিয়ে তারা মনুসংহিতাকে সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠা করবে। সতীদাহ প্রবর্তন করবে। শূদ্র বেদ পড়লে তার জীভ কেটে নেবে। এইসব কথা পত্রপত্রিকায় লিখে চলেছে বুদ্ধিজীবীরা। এদের উদ্দেশ্য উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণে বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে হিন্দুসমাজকে ছিন্নভিন্ন করা।

বুদ্ধিজীবীরা মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অনড় হিংস্র ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। সাদ্দাম হোসেনের মতো একটা যুদ্ধবাজ ডিক্টেটারের জন্য এদের এদের কলম সক্রিয় হয়। শ্যামাপ্রসাদের জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে একটা প্রবন্ধের শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখার সাংবাদিক এবং প্রকাশ করার মতো পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে নেই। নানা ঘটনায় দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে জনগণের মোহভঙ্গ হতে শুরু হয়েছিল অনেক দিন। মোহমুক্ত হয়েছে অযোধ্যা কাণ্ডের পর। অযোধ্যা কাণ্ড ঈশ্বরের একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। নাহলে এত তাড়াতাড়ি জানা যেত না মুসলমানেরা ভারতে বসে কত বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছে। আর জানা যেত না এদেশের বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক লেখকদের সঠিক ভূমিকাটা কি? ১৯৯০ সালের করসেবায় নির্মম হত্যাকাণ্ডের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল

এরা। হত্যার পরে এতগুলি মানুষের জন্য একটুও সমবেদনা না দেখিয়ে, হিন্দুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের বক্তব্যে রচনায়। প্রায় সব বুদ্ধিজীবী যে এতোটা হিন্দুবিদ্বেষী এবং মুসলীমতোষক তা মানুষের জানা ছিল না। তারা জানত না এরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আর্টিলারী বাহিনীর কাজ করে যাচ্ছে ভারতে। আগেও কোনো দেশকে ইসলামী অধিকারে আনার জন্য মুসলীম বাদশারা সেই দেশে একদল পীর-ফকির মুস্কিল-আসান পাঠিয়ে দিত। তারা গাঁয়ে-গঞ্জে ধর্মের নামে অবাধ বিচরণ করত। খোঁজ নিত মানুষের মনোভাবের। রাজার সামরিক শক্তির। সেইসব গোপন খবর পাঠিয়ে দিত যথাস্থানে। ইসলামের অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করত। তাবিজ-কবচ-ঝাড়-ফুঁক দিয়ে মানুষের কল্যাণ করার নামে প্রচার করত ইসলামের মহিমা। অন্যধর্ম সম্পর্কে সৃষ্টি করত হীন ধারণা। পৃথ্বীরাজের পতনের আগে এই কাজ করেছে খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি। দরগায় বসে গোপন খবর পাঠাত মহম্মদ শাহাবুদ্দিন ঘোরীকে। যার জন্য ভারতের সমাজ জীবনে দীর্ঘদিনের অন্ধকার নেমে আসে।

দেশের মানুষেরাও এসব খবর রাখে না। পরমানন্দে আজমীরে গিয়ে চাদর চড়িয়ে আসে। এইসব কারণে মানসিক ভাবে দূর্বল হয়ে থাকত হিন্দুরা। ইসলামী আক্রমণের সময় থাকত উদাসীন। ভাবত এতে বোধহয় ভালই হবে। পীর ফকিররা তাই বোঝাত। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা শুধু পীর-ফকিরের মতো নয় মুয়াজ্জিম খাতিবদের মত। আজ ভারতে এবং পৃথিবী জুড়ে হিন্দুদের শেষ করে দেবার জন্য একটা জল্লাদের মিছিল সুরু হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে তার রক্তপান করছে কিছু উগ্রপন্থী আকালি সঙ্গে মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গ আসামে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের থাবা। পাকিস্তান বাংলাদেশের হিন্দুরা বীভৎস অত্যাচারের সম্মুখীন অনেক দিন ধরে। কাশ্মীরে নিরন্তর হিন্দু হত্যা ও হিন্দু বিতাড়ন হচ্ছে প্যানইসলামের হাতে। পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ছুরি শানাচ্ছে

খৃষ্টানেরা। মাঝে মাঝে হানছে আঘাত। উগাণ্ডা ফিজি শ্রীলংকায় তাণ্ডব করছে সে দেশের অস্ত্রধারীরা। মরছে হিন্দু। স্বদেশে বিদেশে আক্রান্ত এই নিরীহ হিন্দু প্রাণীটিকে রক্ষার জন্য একটি বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও আকুলতা দেখা যায় না। বরং স্বদেশী বুদ্ধি জীবীরা আক্রান্ত অসহায় হিন্দুকে সম্মিলিত পদাঘাত হননে উদ্যত। এ উদ্যমের পিছনে প্রেরণা অঢেল পিছল টাকা। এইসব তথাকথিত বিদ্বান পণ্ডিতেরা সবাই ভোগবাদী। দেহসর্বস্বতাই এদের মুক্তি মোক্ষ। দেশপ্রেম চরিত্র সংযম, হিন্দুত্ব এবং তার বিশ্বজনীনতা তা মানবিক মূল্যবোধ এদের কাছে গণনীয় নয়। টাকা পাওয়া এবং আরো পাওয়ার লোভে এরা জ্ঞানশূন্য। তাদের কাজের ফলাফল নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেছে।

আনন্দের কথা, জনগণ সত্যকে গ্রহণ করছেন। তাই বুদ্ধিজীবী কলমচিদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া সমাজে হচ্ছে না। হলে সারাদেশে বিপুল হিন্দু জাগরণ ও ভারতীয় জনতা পার্টির অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি সম্ভব হতো না। বরং এদের অন্ধ মোল্লাতোষণ এবং অকারণ হিন্দুবিদ্বেষ হিন্দুসমাজে বিপরীত ক্রিয়া ঘটিয়ে দিচ্ছে। একটি দেশের প্রধান সমাজ সংখ্যাগুরুরা যে অধিকার পাবে না সে অধিকার ভোগ করবে সংখ্যালঘুরা। ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিচিত্র ব্যাখ্যায় মানুষের উত্তাপ বাড়ছে। মুসলীম সমাজের একাংশেও এদের জন্য জমে উঠেছে ঘৃণা। তারা আশঙ্কা বোধ করছে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তারা বুঝতে পারছে বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিহীন তোষণে গরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ ক্রমেই তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছে। যার ফল ফলতে পারে ভংয়কর। সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক নাট্যকারদের প্রতি জনগণের হৃদয়ে পুঞ্জিত হচ্ছে ঘৃণা। নিজেদের লেখা বলা তারা ভুলে যেতে পারে। সচেতন মানুষ কিন্তু কিছুই ভোলে না।

প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু যিনি যৌবনে "সাড়া" এবং মধ্যাহ্নে "রাতভর বৃষ্টি" লিখে অশ্লীতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৯৫৩ সালে তিনি একটি

প্রবন্ধপুস্তকে লিখেছিলেন ঃ দেশপ্রেম বস্তুটি আমার মধ্যে নেই। সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি এই গানে আমার মধ্যে কোনো হৃদয়াবেগ সৃষ্টি হয় না। বইটির নাম স্বদেশ ও সংস্কৃতি। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় কলকাতায় একটি লেখকদের সভায় বুদ্ধদেব বললেন ঃ আমাদের এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যাতে পাঠকের হৃদয়ে তীব্র দেশপ্রেম উপজিত হয়। কারণ চীন আমাদের এমন একটি স্থানে আঘাত করেছে যা প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। তার নাম স্বাধীনতা। এই বক্তৃতার পূর্বে নটি বছর আগে তিনি কোথায় কি লিখেছিলেন ভুলে গেলেন। কিন্তু আমি ভুলিনি। তৎক্ষণাৎ 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় একটি তীব্র আক্রমণাত্মক প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছিলাম ঃ সুয়েজ খানিকটা সরু করে কাটালে কি হতো অথবা ক্লিয়োপেট্রার নাকটা কিঞ্চিৎ চ্যাপটা হলে কি হতো না এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সহজ; অনেক বেশী শক্ত কাজ এই বঙ্গের কতিপয় কবি রসকলি এবং সাহিত্যিক নামাবলীধারী ব্যক্তির জাতি নির্ণয় করা। পাগল এবং স্বার্থান্বেষী একসঙ্গে কেউ হতে পারেন কিনা জানা নেই। তবে অষ্ট্রেলিয়াতে এক ধরনের প্রাণী আছে যারা যুগপৎ অণ্ডজ এবং স্তন্যপায়ী। একমাত্র এই প্লাটিপাসের সঙ্গে তুলনীয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক কবি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর। পত্রিকা তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। নিরুত্তর ছিলেন কবি।

আরেকজন বৃদ্ধখোকন ছিলেন অন্নদাশংকর রায়, আই সি এস। তিনি কচিকাঁচাদের জন্য ছড়া লেখেন ঠিক আছে। সে ছড়া আবৃত্তি হয়, গান হয়, লোকের ভালও লাগে। "তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যেসব ধেড়ে খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো।" জনপ্রিয় ছড়া। কিন্তু তিনি যখন সমস্যা নিয়ে কিছু লেখেন তখন মনে হয় স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে বুড়ো খোকাটি এই খণ্ডিত ভারতটুকুও ভাঙার চেষ্টা করেছেন। ১৯৭১ সালে যুগান্তর পত্রিকায় "এই প্লেগ" নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন ঃ "এদেশে মুসলীম বিদ্বেষ এণ্ডেমিক হয়ে গেছে। এখানে এমন একটি দল আছে যারা পারলে

মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, না পারলে ভারত সংস্কৃতির আওতায় আনবে। এরা মুসলমানদের সম্মতি না নিয়ে গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন করে। ভারতে মুসলমান যুবকেরা চাকরী পায় না। হতাশায় তারা কাঁদে। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে"। এই লেখাটি পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নানা ভাষায় অনুবাদ করে এ প্রবন্ধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় পাকিস্তান। ভারতের বিরুদ্ধে শত্রু রাষ্ট্রের হাতে প্রচারের হাতিয়ার তুলে দেয় এদেশের দুর্বুদ্ধিজীবীরা। সি আর ইরানী, কুলদীপ নায়ার ইংরেজীতে লেখেন। সে সব লেখা বিভিন্ন ভাষার কাগজে ছাপা হয়। অতএব এরা বাঘাবুদ্ধি জীবী। এদের প্রত্যেকটি রচনার পতিপাদ্য হিন্দুরা অসহিষ্ণু। হিন্দু সংগঠনগুলি এবং বি.জে.পি হিন্দুধর্মকে কলংকিত করছে এবং ভারতের ঐক্য বিনষ্ট করছে। যুক্তি তথ্য নিষ্প্রয়োজন।

এ লাইনে আদিরসের এবং সবজান্তা আর একজন আছেন সর্দ্দার খুশবন্ত সিং। কলকাতা বইমেলাতে বলে গেলেন, "ভারতে চাই এক নতুন ধর্ম। আমাদের এখন উদ্দেশ্য হোক কাজই পূজা, পূজা কিন্তু কাজ নয়। বিয়ের সময় হোমাগ্নি কিংবা গ্রন্থ সাহেবের সামনে দম্পতিরা শপথ নিন—প্রথম সন্তানের পরই তারা বন্ধ্যাকরণ করিয়ে নেবেন। বনসম্পদ সংরক্ষণের জন্য শবদাহ নিবিদ্ধ করতে হবে। দশটি গাছ লাগানো হোক পৈতের সময়। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে পাশ করে বেরোলে দশটা। বিয়ের সময় পোঁতা হোক কুড়িটা গাছ। বেছে বেছে আমিষ আহারের কোনো মানে হয় না।" এসব হচ্ছে খুশবন্তবাণী। শেষতম কথামৃত কন্যাপণের সঙ্গে যেন কিছু কনডোম দেওয়া হয়।

লক্ষ্যণীয়, সর্দ্দারজী শুধু পুজোর কথাই বলেছেন। যেহেতু হিন্দুরাই পুজো করে। নামাজ প্রেয়ারের কথা বলা হয়নি। বন্ধ্যাকরণের বেলায় হোমাগ্নি আর গ্রন্থসাহেবের উল্লেখ করলেন। অর্থাৎ তার প্রেসক্রিপশন শুধু শিখ ও হিন্দুদের জন্য। কোরান শরীফের সামনে এ বিষয়ে কেউ শপথ নেবে না। এদের জন্য

কনডোমেরও প্রয়োজন নেই। হিন্দুর শবদাহ এখন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে হচ্ছে। সর্বত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি হলে, কাঠ আর খরচই হবে না। অন্যদিকে কবরের পর কবর দেশের অর্দ্ধেকটাই তো কবরস্থান হয়ে গেল খুশবন্ত কি এতে খুশী? বিয়ে, পৈতে, পরীক্ষা পাশের পর গাছ লাগানো ভালো কথা। প্রশ্ন জাগে, যাদের এক স্ত্রী একটি সন্তান তারা আর ক-টা গাছ লাগাবে? যাদের বৌবাজার আর ছাওয়ালপট্টি নিয়ে সংসার তারা একথা মানলে সারাদেশ বনস্থলী হয়ে যেতো। তাদের সুন্নতেও গাছ লাগানোর কথা বলা হলো না কেন? এরা হচ্ছে এদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী। না বেছে মাংস খাদ্য বলা হলো সেটাও হিন্দুদের। ঘুরিয়ে তাদের বলা হলো গোমাংস খেতে। হিন্দুরা অনেকদিন থেকে সংস্কার বিরোধী মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। কলকাতার নামী মুসলীম হোটেল রেষ্টুরেণ্টের খদ্দের তো বেশীর ভাগ হিন্দু। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনে হিন্দুর বাড়ীতে পরিবেশিত হচ্ছে মুরগীর মাংস। তাহলে ঐক্যের জন্য শুয়োর কচ্ছপের সর্বজনীন ভক্ষণের সুপারিশ করা হলো না কেন? ন্যায্য কথা কোনো বুদ্ধিজীবী বলবেন না। যে পক্ষ ধর্ম ও সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে সংহতির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, সকলে আক্রমণ করছে তাকেই। সময় অসময় নেই, পাচ ওক্ত যান্ত্রিক আজানের শব্দদূষণে সকলে নির্বাক। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত হিন্দুপাড়ায় পরিবার পরিকল্পনার দৌলতে শিশুরা কান্না কিংবা কচি কণ্ঠের কাকলি প্রায় স্তব্ধ। পাড়াকে পাড়া খোজা এবং বাঁজায় ভর্ত্তি। অন্যদিকে পাড়া বেপাড়া, ষ্টেশন, প্লাটফর্ম, ফুটপাথ, ব্রীজের তলায়, রেল লাইনের পাশে ড্রেন পাইপের ভিতরে কচুরীপানার মতো উৎপাদিত হচ্ছে ক্রিমিন্যাল এবং ভোটার। রিপোর্টারদের চোখে পড়ে না এসব। তাদের চোখে কি পড়ে?

সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ ৭০ সালে রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে দেশ পত্রিকাতে লিখলেন ঃ ছাত্র পরিষদ এবং ছাত্র ফেডারেশনের তরুণেরা কলকাতা কর্পোরেশনের দাঁত বের করা রাস্তায় মিছিল করে যাবার সময় তাদের শীর্ণ

অপুষ্ট হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে সম্ভব অসম্ভব সব বৈপ্লবিক শ্লোগান দেয়। তারা একটু খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুক না। ইউনিভারসিটি এবং কলেজের ক্যান্টিনে ক্যান্টিনে খাদ্য হিসাবে চালু করুক গোমাংস। গোমাংসে আছে ফ্যাট প্রোটিন এবং যথেষ্ট পরিমাণে এ্যামিনো এ্যাসিড্। ৭৭ সালে তিনি একটি উপন্যাস লিখলেন, "প্রেম নেই"। পটপ্রেক্ষা মুসলীম সামাজিক জীবন। প্রতিপাদ্য হল মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেম নেই। যা আছে তা শুধু বিদ্বেষ। গ্রন্থটি বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হলো। পুরস্কার কারা দেয় আর কারা পায় দেখেও বুদ্ধিজীবীদের জগৎটাকে চিনে নেওয়া যায়।

এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কট্টর মার্ক্সবাদী। সারা জীবন বিপ্লব করে শেষ জীবনে কংগ্রেসের হয়ে পথসভা করলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মার্ক্সবাদবিরোধী লেখা লিখে ভাল পয়সা পাচ্ছেন। তাঁকে দেওয়া হলো সাহিত্যের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। কোনো পাঠক তার একটি উপন্যাসের চরিত্র মনে রাখেনি। একটা কবিতার দুটি লাইন স্মৃতিতে রাখার যোগ্য নয়। প্রশ্ন উঠল চতুর্দ্দিকে। কোন্ লেখাটির জন্য তিনি পুরস্কৃত হলেন? সত্যি তো এর কোনো জবাব নেই। আমতা আমতা করে উদ্যোক্তারা বললেন ওনার সামগ্রিক রচনার জন্য। সে রচনার বেশীর ভাগই তো দেশজননীর বিরুদ্ধে রুশ ভজনা মাত্র। কোনো কবিতায় এমন কিছু নেই কালের পরিপ্রেক্ষায় যার কিছুমাত্র অবদান আছে। তাঁকে দেওয়া হলো জ্ঞানপীঠ।

১৯৮৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল একটি নিম্নমানের চটি বইকে। বইটির নাম "বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা।" লেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই রচনার কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয়েছে ভারতের মুনি-ঋষিদের। তাঁদের চরিত্র হনন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং নবীন। ভারতবর্ষকে বাপান্ত করলে পারলে এদেশে সহজে পুরস্কার পাওয়া যায়। সারা জীবন যে সুভাষবাবু "এ স্বাধীনতা মিথ্যে", "পাকিস্তান

মানতে হবে", "পার্লামেণ্ট শুয়োরের খোঁয়াড়" "সুভাষ বসু কুইসলিং" বলে এলেন—বিশ্বভারতী থেকে এহেন ব্যক্তিকে দেওয়া হলো দেশিকোত্তম উপাধি। পাগলাখানাতে যা হয় না এদেশে বুদ্ধিজীবীদের কাণ্ডকারখানায় তা দেখা যাচ্ছে।

আবার গৌড়ানন্দ প্রসঙ্গে আসা যাক্। ৮৮ সালে দেশ পত্রিকায় লিখলেন, রামচন্দ্র অহল্যাকে বলছে ঃ অহল্যা এতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তোমার গতর কিন্তু একটুও টসকায়নি। একান্তভাবে পতিতা পল্লীর ভাষা প্রযুক্ত হলো রামচন্দ্রের মুখে অহল্যার উদ্দেশ্যে। এটা কি হঠাৎ আকস্মিক অকারণ? না মোটেই না। তার প্রমাণ ৯০ সালে ভাগলপুরের দাঙ্গা। এই ঘটনার অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন লেখার জন্য গৌরকিশোর ৯২ সালে ভাগলপুরে গেলেন। ঠিক দুবছর পর ঘুরে এসে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে লিখলেন, "মানবতার উৎস সন্ধানে"। সেই সময় বিরাটি বানতলা সিঙুরে মানবতা বিধ্বস্ত, নারীজাতি ধর্ষিতা হচ্ছে—তাঁর সেখানে যাবার সময় হলো না। উৎস সন্ধান করে লিখলেন ঃ হিন্দুরা কি নির্মম নৃশংস। শিশু হত্যা করেছে, একটি মুসলীম মেয়ের পা কেটে নেওয়া হয়েছে। কত বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। আর মুসলমানেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হিন্দুদের রক্ষা করেছে। বাড়ী পাহারা দিয়েছে। দাঙ্গার মূল কারণ একটি হোস্টেলে শতশত হিন্দুছাত্র হত্যা। এ কথাটা তিনি কোথাও লিখলেন না। দুর্বল যুক্তি কাঁচা তথ্যের ওপর ভাষার চাতুর্য্য দিয়ে লেখা হলেও খুব সাধারণ মানুষেও বুঝতে পারে এসব লেখার উদ্দেশ্য কি এবং কাদের হয়ে লেখা। ৯৪ সালে দেশে প্রবন্ধ লিখলেন আজ যারা ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তারা যদি দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী হয় তাহলে রাণা প্রতাপ, শিবাজী, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম সবাই দেশদ্রোহী। সংবাদপত্র মহলে একটা কথা চালু আছে—"বিটুইন দি লাইনস"। এই নামে কুলদীপ নায়ারের একটা বই আছে। এই শিরোনামে তিনি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতে লেখেন। কথাটার সরল অর্থ দুটি লাইনের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা থেকে সত্য বার করে নিতে পারে যে

সে বুদ্ধিমান পাঠক। আজকাল লেখকদের অপেক্ষা পাঠকদের বুদ্ধ্যাংক অনেক বেশী। তাই অধিকাংশ লেখকের বই আর জনপ্রিয় হয় না। সংবাদপত্রের প্রবন্ধ অনেকে পড়ে না। সকালে পড়লে বিকেলে তা মনে রাখা অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

সেদিন থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভাগ্যবান লেখক। তাঁর লেখার বিক্রী মন্দ নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুনীল সব রচনায় যৌনতাকে চমৎকার কম্পাউণ্ড করে দিতে পারেন। পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসার মতো সাহিত্য শিল্পের কারবারীরা প্রথম রিপুর তুষ্টি সাধনের চিরন্তন কৌশলে আর্থিক সাফল্য অর্জন করছেন। এই ধরনের লেখকেরা কালের গর্ভে গ্লোরিফায়েড প্রস রূপেই চিহ্নিত হবেন। কালজয়ী সাহিত্যিক রূপে নয়। তবে সুনীল যখন লেখেন ঃ "বালক বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর ছোটমাসীর বুকে মুখ লুকিয়ে আমি যখন কেঁদেছিলাম, সেদিন আমি প্রথম যৌন আনন্দ অনুভব করি।" তখন তাকে শুধু একজন বিকৃতকামী অসুস্থ মানুষই মনে হয় না। মনে হয় সামাজিক সুস্থতা এবং মানবিক মূল্যবোধের হত্যাচেষ্টার একজন অপরাধী। তাই এর কাছে উজ্জ্বল হিন্দুত্বের বিরোধিতা এবং অন্ধকার ইসলামের স্তাবকতা স্বাভাবিক। ছোটমাসী বড়োবৌদি মেজবোন এসব সম্বন্ধ তো হিন্দুত্বের আলোয় চিহ্নিত। অন্ধকারে সব একাকার। তিনি নীললোহিতের নামে একটা উপন্যাসে লিখেছেন ঃ এককেজি গরুর মাংস কিনে মান পাতায় মুড়ে মোড়ল টাইপের একজন মুসলমানের বাড়ীতে গিয়ে রান্না করে দিতে বললাম। সে বলে কিনা আমরা গরুর মাংস খাই না। রোমাণ্টিক উপন্যাসের মধ্যে গোমাংসের প্রচার অকারণে নয়। গৌরকিশোরও গরুর মাংস খেতে বললেন। এগুলো সুপরিকল্পিত। গোলা লেখক হলে এরা মাঝে মাঝে শুয়োরের মাংস খাবার কথাও লিখে ফেলতেন। কই তা তো কখনও দেখা যায় না। কেন দেখা যায় না? বড়ো নিরীহ প্রশ্ন। কিন্তু আজ তীব্র ঝড় হয়ে বয়ে চলেছে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

সুনীল একটি উপন্যাস লিখেছেন, নাম "ধুলিবসন।" নায়িকা যৌবন উর্ত্তীর্ণা উচ্চশিক্ষিতা, স্বামীকে পরিত্যাগ করে বিলেত থেকে চলে এসেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে একান্ত জীবন যাপন করতে গিয়ে সে জড়িয়ে পড়ল স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে। পরিবেশ দূষণ বিরোধী আন্দোলন। একদিন রাত্রে জাভেদ বলে একজন জেলে তার ঘরে ঢুকে শাবল দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে ধর্যণের চেষ্টা করল। পরের দিন একটু সুস্থ বোধ করতেই সে ঠিক করল কলকাতা চলে যাবে। সন্ধ্যার আগে বাড়ী থেকে বেরোতেই একদল তরুণ এসে বলল দিদি আমরা সব শুনেছি। আপনি বললে আমরা জাভেদকে কেটে দু-টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবো। নায়িকা বলল জাভেদ কোথায়? নদীর ধারে। একথা শুনে দ্রুত পায়ে সেখানে সেই দিদি চলে গেল। জাভেদ অসভ্য অশিক্ষিত অর্দ্ধোলঙ্গ। নদীতে মাছ ধরে। তার কাছে গিয়ে বসল নায়িকা। হাতে হাত রেখে বলল, জাভেদ কাল রাতে তুমি আমার কাছে যা পেতে চেয়েছিলে তা কি এইভাবে পাওয়া যায়? এরপর নায়িকার আত্মসমর্পণ এবং জাভেদের সঙ্গে নৌকাতে ঘর বাঁধা। এখানেও শেষ হয়নি।

বিলেত থেকে মেয়ে জামাই এলো একদিন। জাভেদ একটা ছেঁড়া গামছা পরে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মা চোঙায় ফুঁক দিয়ে ধোয়ার মধ্যে উনুনে মাছ ভাজছে। মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ "হাই নাইস! মা তোমার পছন্দকে আমরা কনগ্রাচুলেট করছি।" সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা নাকি মানবিক মূল্যবোধকে ধরে রাখেন তাঁদের লেখায়। যা থেকে হয় জনশিক্ষা। এ উপন্যাসে কি শেখানো হলো? আলোকপ্রাপ্তা হিন্দুনারী প্রৌঢ়া বিলেত ফেরৎ বড়ো বড়ো ছেলে মেয়ের মা হলেও তার চেয়ে বয়সে ছোটো ধর্ষক মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণই তাদের ভবিতব্য। এ বিষয়ে তিনি মেয়ে জামাইকে দিয়ে সার্টিফিকেটও দিয়ে দিলেন। এ লেখা কি শুধুই বৈচিত্র্যসৃষ্টি? খেজুরগাছ অতটা মসৃণ নয়। তরল টাকা এই গরল সাহিত্যের টনিক।

সুনীলের রাধাকৃষ্ণ নামে একটি উপন্যাস বাংলাদেশে সিনেমা হয়েছে। কাহিনীতে সচেতন ভাবে আহত করা হয়েছে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসকে। কৃষ্ণ গায়ক আর রাধাকে বিধবা সাজিয়ে প্রায় ব্লুফিল্মের মতো দেহজ প্রেমের বাণিজ্যিক ছবি হয়েছে রাধাকৃষ্ণ। বাংলাদেশের হিন্দুরা এই ছবি দেখে ব্যথিত মর্মাহত। লেখক বলবেন, এতে আমার কিছু করার নেই। লেখার উপাদান আমি যে কোনো ক্ষেত্র থেকে নিতে পারি। একথাটা মেনে নেওয়া যেত যদি তিনি হজরত মহম্মদ এবং খাদিজা বিবিকে নিয়ে একটা মনোরম উপন্যাস লিখতেন। তসলীমা নাসরিন লিখেছে মহম্মদের চোদ্দটি স্ত্রী। সকলকে নিয়ে লিখতে হবে না। প্রথমা স্ত্রী খাদিজা মহম্মদের অপেক্ষা পনেরো বছরের বড়ো। ইডিপাস কমপ্লেক্সের বাড়তি মাত্রা যোগ করে একটা জমাটি উপন্যাস হতে পারে।

যীশুকে নিয়েও হতে পারে। কুমারী মা মেরীর গর্ভে পুরুষের সংসর্গ ছাড়াই যীশুর জন্ম তো কম রহস্যময় নয়। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল লেখকদের ঔদাসীন্য একটা সত্যকেই প্রমাণ করে হিন্দুর বিরুদ্ধে লেখার জন্য এরা নির্দিষ্ট। নইলে হিন্দুদের একটি আরাধ্যাদেবী সম্পর্কে সুনীল বলতে পারেন "কালী হচ্ছে বিকৃত বীভৎসদর্শনা সাঁওতাল মাগী"। এতে ভাল টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু আক্রান্ত হবার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই। তাই এখন তাঁর কলম লাগামছাড়া। ৯৪-এর শেষে আনন্দবাজারে লিখলেন ঃ হিন্দুর দেবদেবী অর্চ্চনা নেহাৎই পুতুল পুজো। পূর্ববঙ্গ থেকে যে ইসলাম তাঁকে ভিটেছাড়া করেছিল তাদের সম্পর্কে লিখলেন ইসলামের তত্ত্ব অতি মহৎ ও সূক্ষ্ম। হিন্দু সমাজ কিন্তু শিখে যাচ্ছে, মার খেলে কবি সাহিত্যিক নয়, সমাজ যাদের বিদ্বান পণ্ডিত বলে মান্য করে তাঁরাও অর্থোপার্জ্জনের সহজ পথ হিসাবে এটাকেই বেছে নিয়েছেন ভাবনাচিন্তা করেই।

পণ্ডিত অতুল সুর দুটি বই লিখেছেন। একটির নাম "ভারতের বিবাহের ইতিহাস"। বইটা মৌলানা মৌলভীরা বক্তৃতা করার সময় সঙ্গে রাখে। মুসলমানদের বহু বিবাহের পক্ষে এ বই থেকে যুক্তিজাল সৃষ্টি করা হয়।

অতুলবাবু লিখেছেন ঃ বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা বস্তা বেঁধে বিয়ে করতেন। এক একজন দুশো থেকে তিনশো পর্য্যন্ত বিবাহ করেছেন"। হিন্দু সমাজ বহুমাত্রিক। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ একটি ক্ষুদ্র অংশ। কুলীনেরা তার ভগ্নাংশ। তাদের কিছু মানুষ এগুলি করত। বহুবিবাহ হিন্দুর সামাজিক বিধি ছিল না। ছিল বিকৃতি বা ব্যাধি। এরা নিন্দিত ছিল সমাজে। গতিশীল হিন্দুসমাজ সুযোগ পাবা মাত্রই তার উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু যাদের বহুবিবাহ চোদ্দশো বছর ধরে অনড় জগদ্দল, একুশ শতকের দ্বারে দাঁড়িয়ে হারেমে পাঁচশো বিবি রেখে আশী বছরের বৃদ্ধ দশ বছরের আমিনাকে বিয়ে করে নিয়ে যায় যখন, তখন অতুলবাবুরা চোখ বুজে থাকেন কেন? দেশের মানুষ এখন জেনে গেছে, গণমাধ্যমের প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন চলে গেছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের দখলে, তেমনি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ ব্যক্তিকে তারা কিনে ফেলেছে।

অতুল সুর আর একটি বই লিখেছেন, "হিন্দু দেব-দেবীর যৌন জীবন।" বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং নামকরণ লক্ষ্যণীয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি লিখলেন ঃ দেবতারা অস্তিত্বহীন। নক্ষত্রের নামে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। অস্তিত্বহীন কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি কিন্তু যৌনাঙ্গ খুঁজে পেয়ে গেলেন। যেহেতু হিন্দুর দেবদেবী। অন্যধর্মের বাস্তব চরিত্র নিয়ে, তাদের যৌন জীবন নিয়ে কোনো সাহসী পণ্ডিতকেও কোনোদিন কিছু লিখতে দেখা যায় না। কারণগুলি নিয়ে জনমনে সংশয় ও সন্দেহের মেঘ জমে ছিল অনেকদিন থেকে। এখন তারা সংশয় উত্তীর্ণ।

পতি পরিবর্তন দক্ষা বিপ্লবিনী এখন শবর লোধা প্রতিবন্ধীদের পরিত্রাণকারিণী রূপে অবতীর্ণা। একাজ অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে ভোঁতা আক্রমণগুলি তার চরিত্রকে চিনিয়ে দেয়। অযোধ্যা নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিযোদগার করা একটি ফ্যাশান। শুধু ফ্যাশান নয় আরব দুনিয়ার প্রতি বিশ্বস্ত এবং লয়াল প্রমাণের প্রতীক।

মহাশ্বেতা দেবী এক কদম এগিয়ে সংবাদপত্রে লিখলেন ঃ সুলতান মামুদ বারবার সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেছিলেন কেন? ওখানে প্রচুর দেবদাসী বন্দী অবস্থায় দুঃখে দিন যাপন করছিল। মামুদ তাদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য বারবার মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। সুস্থ মস্তিষ্কে একথা লেখার মতো লেখিকা প্রকাশিত হবার মত সংবাদপত্র এদেশে আছে। মুসলমান বাদশারা বন্দী হিন্দু দেবদাসীদের মুক্তি দেয়। তার জন্য বারংবার আক্রমণ কেন? একবারে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি? যাদের হারেমে হাজার হাজার নারী বন্দী তারা কাতর হয়ে গেলে হিন্দু দেবদাসীদের জন্য। ইতিহাস নিজেদের যুক্তি-বিবেচনা দিয়ে পড়লে হবে না। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি দিয়ে পড়তে হবে।

এরফান হাবিব রোমিলা থাপারের নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস লিখতে এগিয়ে আসছেন অজস্র বুদ্ধিজীবী। এসব লেখার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর। এবার পড়ানো হবে প্রত্যেকটি সুলতান বাদশা ছিল ব্রহ্মচারী তপস্বী। সুরা তাদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, নারীরা সবাই মাতৃবৎ। হাজার হাজার পরমাসুন্দরী বেগম থাকত হারেমে—সে শুধু ব্রহ্মচর্যের এক্সপেরিমেণ্ট, আর প্রাসাদের শোভাবর্দ্ধনের জন্য। নারী নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে পিতাপুত্রে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ? ওগুলি হিন্দুদের বানানো মিথ্যে কথা। হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস? ওটা সত্যিকারের ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। অপবিত্র মন্দিরের পবিত্রতা ফিরিয়ে দেবার জন্য। এসব রসিকতা নয়। তরল ডলারের কাছে আত্মবিক্রয়কারী কিছু প্রাবন্ধিক ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে এগুলো লিখেছে। তারা লিখেছে ঃ আওরঙ্গজেব বহু হিন্দু মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। তিনি হিন্দুর মন্দির অকারণে ভেঙে দিতে যাবেন কেন? কাশী বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙেছিলেন হিন্দু জনগণের আকুল আবেদনে। একজন কুলাঙ্গার মোহন্ত মন্দিরের ভেতরে কচ্ছের মহারানীকে ধর্ষণ করে মন্দির অপবিত্র করেছিল। মহর্ষি আওরঙ্গজেব তাই মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে ওটি পবিত্র

করেছিলেন। এই অদ্ভুত পারস্য উপন্যাসের প্রতিবাদ করেননি কোনো বুদ্ধিজীবী। কেন করবেন? তাঁরা তো এক খোঁয়াড়েই সামিল আছেন। আজগুবি কাহিনী সম্পর্কে আগে লোকে বলত গল্পের গরু গাছে ওঠে। এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ দেখে বলা যেতে পারে, রাসভ বুদ্ধিজীবীদের রচনা শুধু গাছে নয়, তরতরিয়ে মগডালে উঠে যেতে পারে। ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেননি কেউ। স্মিথ টয়েনবি যদুনাথ সরকারেরা এসব কথা কোথাও লেখেননি। এঁরা লিখে দিলেন। কারণ এতে নগদ লাভ আছে। আর ঠ্যাঙানি খাবার আশংকা নেই।

বীরেন মিত্র 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' নামে একটি উপন্যাসে লিখেছেন। বিষয়, কৃষ্ণ ভারতের লোকই নয়। তিনি ট্রেসপাসার দুর্য্যোধনেরাই সন অফ দি সয়েল। মাটির সন্তান।

এর চেয়েও সাংঘাতিক কথা লেখার লোক আছে। কালিকারঞ্জন কানুনগো। বইয়ের নাম রাজস্থান কাহিনী। লিখেছেন ঃ ২১ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাস পড়িয়েছি। হজরত রসুলুল্লাহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে মারহাব্বা পেয়েছি। আমার ধারণা হয়েছে একমাত্র মুসলমানদেরই সত্যিকার ঐতিহাসিক সাহিত্য আছে, হিন্দুর কিছুই নেই। আকবর বিক্রমাদিত্যের অপেক্ষা ব্যক্তিত্বে ও রাজনীতিতে এবং পরাক্রমে ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। নবযুগের প্রবর্তক মহাপুরুষ। ভারতের জাতীয়তার প্রতীক। মহামতি আকবর ও রাজা মানসিংহ হচ্ছেন কলিযুগের অবসানে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবতার। ইসলাম এশিয়ার ফরাসী বিপ্লব। আরব জাতি এ বিপ্লবের অগ্রদূত। ইনি ডলার জল খেয়ে এসব লিখেছেন বিশ্বাস হয় না। ইনি গোত্রে আলিমান হলেও সম্ভবতঃ মালে সোলেমান।

ইসলামের এইসব নিষ্ঠাবতী সেবাদাসীরাই এখন এদেশে পণ্ডিত স্কলার অধ্যাপক। নাটকের জগৎটি আগে থেকেই তাদের দ্বারা দখলীকৃত। দামী নাট্যকারেরা প্রভুদের আদেশ পালন করে যাচ্ছে ইমানদার বান্দার মতো। মন্ত্রবলে নাট্যকারের হাতে মা আনন্দময়ীরা হয়ে যাচ্ছে বিবি আনন্দময়ী। আর বেগম

সুলতানারা হয়ে যাচ্ছে দেবী সুলতানা। বাবাকে সেলাম মাকে প্রণাম নামেই মালুম হয়, কে হিন্দু মুসলমান। আর এর উদ্দেশ্যই বা কি! অত্যাচারী ধর্মদ্বেষী ধর্ষকামী চরিত্রহীন বাদশাদের চরিত্র নাট্যকারের গুণে হয়ে যাচ্ছে দয়ালু ধর্মপ্রাণ চরিত্রবান। সব ধর্মের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা। বুকের মধ্যে প্রেমের ফল্গুধারা। নির্মম নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হয়ে গেছে সমাজের জন্য কিংবা কোনো নারীর বিশ্বাসঘাতকায়। প্রত্যেকটি পাষণ্ড চরিত্রকে চিত্রিত করা হচ্ছে এইভাবে। হিন্দুর মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে অত্যাচারী সুলতান। পরিত্রাহি চীৎকার করছে মেয়েটি কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও। অট্টহাসি হাসছে মুসলিম বাদশা। হিন্দু যুবক আনন্দে হাততালি দিয়ে অভিনয়ের প্রশংসা করছে। একবারও তাদের মনে হচ্ছে না যে তার চোখের সামনে বিধর্মীর হাতে মাতৃহরণ হয়ে গেল। কেউ মনে করিয়ে দিলেও তাদের প্রতিক্রিয়া হয় না। ভাবে, ইতিহাসে পড়ি, এভাবেই নিয়ে গেছে। বাস্তবে দেখি, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা উত্তেজিত হবার কি আছে? ওকে তো গ্রীনরুমে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে। হিন্দুর এই শিথিল মানসিকতা নাট্যকারদের উৎসাহিত করে। বিদেশের টাকা নিতে বিবেকের পীড়ন কিংবা আসরে পালে আগুন লাগিয়ে দেবার ভয় কোনোটাই তাদের থাকে না। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরানোর নাটক লেখা হয় "মরমীবধু"। একেবারে আকবর বাদশার টেকনিক। নায়ক মুসলমান নায়িকা হিন্দু। হিন্দুর মেয়ে মুসলমানকে দিলে তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। আকবর যেমন কোনো হিন্দু সেনাপতির সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে দেননি। তবু তিনি মহান এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জনক। দেশের বিদ্বানেরা এটাই তো শেখাচ্ছেন।

নাট্যজগতের লোকেরাও তাই। হিন্দুর ছেলে মুসলমান মেয়েকে ভালবাসবে এবং নানা বাধাবিপত্তি ও নাট্য সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তাকে বিবাহ করবে এমন নাটক হয় না কেন? প্রথম কারণ, পয়সা বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ, এ ধরনের সম্প্রীতি মুসলমানেরা সহ্য করবে না। হিন্দু মানসিকতা এর ভালমন্দ

বুঝতে অক্ষম ছিল এতদিন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে হিন্দু মেয়েদের ঘর ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, তারা বুঝতে পারেনি। নাট্যকার, দলমালিক, অভিনেতারা বোঝেও না বোঝার ভান করে। চেতনাহীন হিন্দুরা এইসব নাটক দেখে স্বাভিমান শিথিল হয়ে যায়। অন্যধর্মের কাছে আত্মসমপর্ণে কোনো বেদনা থাকে না। সিনেমা শিল্পেও একই ব্যাপার। হিন্দুধর্মকে ছোট করে অন্য ধর্মকে মহিমান্বিত করে লেখা হয় চিত্রনাট্য। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণদের দেখানো হয় চোর-চোট্টা-লম্পট-বদমাস-স্মাগলার রূপে। দশনম্বরী ছবিতে এক গুরুর কাজই হলো যুবতী শিষ্যাদের নেশায় আচ্ছন্ন করে তাদের সম্ভ্রম নাশ করা। 'রাম তেরী গঙ্গা ময়লী'তে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে উঠে নায়িকাকে অসৎ উদ্দেশ্যে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা লুক থ্রু করে বারবার দেখাচ্ছে পৈতেটাকে। দেখো, ব্রাহ্মণেরা কত জঘন্য চরিত্রের হয়। এগুলো তো বাণিজ্যিক ছবি। আর্ট ফিল্মে হিন্দু বিরোধিতা আরও তীব্র।

সত্যজিৎ রায়ের দেবী, গণশত্রু অশনি সংকেত, হিন্দু সংস্কারে আঘাত হানার প্রচেষ্টা। অপর্ণা সেনের 'পরমা' ছবিতে গৃহস্থ বধূদের আহ্বান করা হয়েছে বহুবল্লভা হতে। সমাজের স্থিতিশীলতা মূল্যবোধ ভাঙার জন্য। অপর্ণা নিজের জীবনে যা ভেঙে চলেছে। তার সতী ছবিও হিন্দুধর্মকে বিকৃত ও আঘাত করে দেখানো ছবি। অবশ্য সতী কেউ দেখেনি। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'দেবশিশু' এই ঘরানার। গৌতম ঘোষের 'অন্তর্জলী যাত্রা' এই সিরিজের নিকৃষ্টতম ছবি। হিন্দু সমাজপতিদের হৃদয়হীনতা। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের উদগ্র বাসনা। বৃদ্ধের মুখে অশ্লীল সংলাপ। নায়ককে দিয়ে অরুচিকর বাক্য, উচ্চবর্ণকে অকারণ আক্রমণ। হিন্দু বধূ চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে এটা দেখতে এদের খুব আন্তরিকতা। সত্যজিৎ দেখালেন, অশনি সংকেতে বধূ দেহ বিক্রয় করতে গেল ইটভাটার মালিকের কাছে। অন্তর্জলী যাত্রায় গৌতম শবদাহকারী ডোমের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে দিল ব্রাহ্মণ বধূর। ডোমে আপত্তি নয়, আপত্তি সম্পর্কের। ঘোরতর আপত্তি দৃশ্যগুলি উপস্থাপনের।

আরবীয় অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার। এসব বই মানুষ দেখে না। বাণিজ্যিক ভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। তবু আবার নতুন ছবি করতে এদের টাকার অভাব হয় না। খুব সাধারণ মনোরঞ্জনী ছবিতেও হিন্দুর শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলিতে আঘাত করা হয়। 'ইনসাফ কি আওয়াজ' ছবিতে আসরানী এবং অরুনা ইরানীকে রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে ডিস্কো নাচ নাচানো হলো। কৃষ্ণঅবতার ছবিতে রোগ সারাতে ব্যর্থ হলো সব হিন্দু বেদস্থান ও দেবতারা। সেরে গেল মাজারে গিয়ে। নায়ক-নায়িকা বিপদে পড়লে তাদের একমাত্র আশ্রয় গীর্জ্জা কিংবা মসজিদ। ত্রাতা ফাদার এবং মৌলভী। এদের চরিত্রগুলি দেখানো হয় করুণাঘন পুত পবিত্র করে। সিনেমায় খ্রীষ্টানী অনুপ্রবেশ অনেকদিনের ব্যাপার। সুচিত্রা অভিনীত উত্তর ফাল্গুনী ছবিতে নায়িকা তার মেয়ের শিক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য পেল শুধু চার্চ পরিচালিত আবাসিক স্কুল। সপ্তপদী ছবিতে রীনা ব্রাউনের ধর্মের কাছে সারেন্ডার করল কৃষ্ণেন্দু মুখার্জ্জি এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ পিতা। ঘটনা সামান্য, তাও সিনেমা, তবু এসবের এফেক্ট হয়েছে অনেক দূর পর্য্যন্ত।

এখন খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা বহুগুণ প্রভাব ইসলামের। ডায়ালগে পর্য্যন্ত ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কাহিনী এবং চরিত্রে তো আছেই। রানী মা ম্যায় এক সাচ্চা মুসলমান হুঁ। সাচ্চা মুসলমান কভি গদ্দারী নেহি কর সাক্তে। একটি হিন্দী ছবির সংলাপ। রানী মা আমি একজন খাঁটি মুসলমান। খাঁটি মুসলমান কখনও বিশ্বসঘাতকতা করে না।

আর একটি ছবিতে শোনা গেল, নায়ক বলছে ঃ মেরা নাম আব্দুল ম্যায় মুসলমানকা বাচ্চা হুঁ। একবার যব তুঝে বহিন কহা তো ম্যায় কেয়া? তেরে লিয়ে মরা পুরা খানদানকো নিছাবর কর দুংগা। আমার নাম আব্দুল, আমি মুসলমানের ছেলে। একবার যখন তোকে বোন বলেছি তখন আমি কেন আমার পুরো পরিবার তোর জন্য জীবন দিয়ে দেবে। কটু সত্য হচ্ছে, এগুলো বাস্তবে দেখা চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু মুসলমান চরিত্রের মুখ দিয়ে এইসব

সংলাপ বলানো হয়। হিন্দু চরিত্রের মুখে কখনো হিন্দু হওয়ার জন্য গর্বিত সংলাপ শোনা যায় না। সে শুধু মানবতার কথা বলবে সব ধর্ম সমান বলবে।

'তুফান আউর বিজলী' ছবিতে কাদের খানের লিপে গান গাওয়ানো হলো ঃ ময়দানে এ মুসলমান আয়া মহম্মদকে নাম পর। মানে মহম্মদের নাম নিয়ে মুসলমানেরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। যে কোনো খলনায়ক যদি চরিত্রটি মুসলমান হয় তাহলে তার মৃত্যুর সময়ে করুণ আজান ধ্বনি একটি মসজিদ অথবা মক্কার কাবায় লক্ষ লোকের নামাজ দেখানো হবেই। 'কুলি' ছবিতে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টিতেও নায়কের কিছু হলো না। কারণ নায়ক মুসলমান। মাজার থেকে একটা সবুজ চাদর উড়ে এসে পড়ল তার গায়ে। আল্লার দোয়ায় অক্ষত রয়ে গেল। 'দীওয়ার' ছবিতে বুকে গুলি খেয়েও বেঁচে গেল নায়ক। কারণ তার পকেটে ছিল একটি তামার পাত যাতে লেখা ৭৮৬, মানে বিসমিল্লা হীর রহমানে রহিম।

এই যে ইসলামকে মহিমামণ্ডিত করে সিনেমায় দেখানোর খেলা এগুলো কারো আকস্মিক খেয়াল নয়। একটি সুবিশাল চক্রান্তের অনিবার্য্য পরিণতি। বিদেশী দক্ষ বাজীকরদের খেলাটাই এখানে শেষ কথা। বোম্বের ফিল্মী দুনিয়াকে এখন নিয়ন্ত্রণ করে আরব এবং তাদের সাহায্যপুষ্ট মাফিয়া ডনেরা। দাউদ ইব্রাহিম হাজীমস্তানেরা ঠিক করে দেয় হিন্দী সিনেমার গাইড লাইন। পরিচালক নায়ক-নায়িকা ডায়ালগ সিচুয়েশন পর্য্যন্ত। বলিউডের সিনেমা শিল্পে শত শত কোটি টাকা খাটছে দাউদ ইব্রাহিমের। বোম্বে ফিল্ম জগতের যে-কোনো নায়ক নায়িকা গায়ক-গায়িকাকে ইচ্ছে করলেই সে উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে দুবাই। বোম্বেতে তার ইচ্ছাই শেষ কথা। ছবিতে মুসলমান নায়ক হিন্দু নায়িকা রোল পায় তার ইচ্ছায়। বোম্বে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে হঠাৎ এতো মুসলমান নায়ক-নায়িকা পরিচালক সঙ্গীত পরিচালক গায়কের উত্থানের পিছনে আছে তারই কলকাঠি। তার অঙ্কশায়িনী হয়নি এমন নায়িকা বোধ হয় কমই আছে। ক্রিকেট

এবং রাজনীতির জগতে তার প্রভাব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা এখন সুবিদিত।

বোম্বে বিস্ফোরণের পর দাউদ ইব্রাহিম সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকদের কাছে খবরের বড়ো খাবার হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে গেল। কিন্তু বোম্বের ফিল্মী দুনিয়া এবং দাউদ সম্পর্কে আমার এই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৯ সালে আমার প্রকাশিত গ্রন্থ 'চলমান ঘটনা বহ্নিমানপর্বতেও' এ ঘটনা সংলগ্ন আছে। প্রশ্ন এখানেই, আমার মতো একজন ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক যদি ৮৬ সালে দাউদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারে তাহলে দেশের দক্ষ সাংবাদিকেরা কি করছিলেন এতদিন? ৯৩-এর বিস্ফোরণ না হলে হয়ত এরা এখনও নিদ্রিত থাকতেন। হ্যাঁ ঘুমিয়েই থাকতেন। তবে এ নিদ্রা যোগনিদ্রা। সংবাদপত্রে আরবীয় অর্থ যোগনিদ্রা। এতে আচ্ছন্ন দেশের সংবাদপত্রের একটি বড়ো অংশ। সে আলাদা প্রসঙ্গ। এখন থাক্। সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে হবে।

অসংখ্য মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত দাউদ দুবাই থেকে পরিচালনা করে তার অন্ধকারের সাম্রাজ্য। ১৯৮৮ সালে দাউদ মহারাষ্ট্র সরকারকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। "আমার বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নিন। আমি রাজ্য সরকারকে পাঁচশো কোটি টাকা বিনা সুদে ঋণ দেবো।" দেশের সর্ববৃহৎ গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে এরাই। সেক্স ভায়োলেন্স হুল্লোড় উচ্ছৃঙ্খল অপরিমিত ভোগের একটি ছবি এঁকে দেওয়া হচ্ছে যুব মনে। এই মানসিকতা সম্পন্ন তুরুণদের ডিমরালাইজড্ করতে সময় লাগে না। এসবের প্রকৃত প্রতিষেধক হিন্দু দর্শনের শান্ত সংযত প্রশান্ত জীবন ধারা। তাই এদের সবার লক্ষ্য ক্রাশ হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বকে শেষ করে দাও। গণমাধ্যমে প্রচারিত দাস বুদ্ধিজীবীরা একাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করে যাচ্ছে। শুধু বোম্বে সিনেমা নয়, বাংলা ছবিতেও তাদের প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান। এখানে খাটছে সাট্টাডন রশিদ খানের টাকা। ছবিতে আমদানী

হচ্ছে কষ্টকল্পিত অথরব্যাকিং মুসলিম চরিত্র। রক্তেলেখা ইমনকল্যাণ মা বা যে কোনো ছবি দেখলে একথা বোঝা যাবে। যেমন অঞ্জন চৌধুরীর আব্বাজান। বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। একটি হিন্দু মেয়ের জন্য এক মুসলমান বাপের আত্মদানের কাহিনী। সমাজে ঘটে কিন্তু অন্য। মামা চাচা বাবা যে সম্পর্কই হোক হিন্দু নারী হরণ যাদের গণ অভ্যাস তাদের আড়াল করার ছবি আব্বাজান। হিন্দুর দেবদেবী স্বর্গ যমপুরী নিয়ে পরিবেশিত হয় হাস্যরস। মুসলমানদের বেহেস্তের মনোরম বিবরণ কোরানে থাকা সত্ত্বেও কোনো বিপ্লবী নাট্যকার কিংবা চিত্রপরিচালক সেখানে হাত দিতে সাহস করেন না। সবটা ভয়ে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পিছনে আছে প্রাপ্তির মুষ্টিযোগ। হিন্দুধর্ম, হিন্দুজীবন বোধকে ছোট করে লঘু করে দেখাবার জন্য ব্যয় করে বিদেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চে তুলে ধরার জন্য থাকে নির্দেশ। আদেশ নিখুঁত ভাবে পালন করে বুদ্ধিজীবী ক্রীতদাসেরা। বুদ্ধিজীবীরা ক্রীতদাস হলে সে দেশের মানুষের মূল্যবোধ ধ্বংস হতে দেরী হয় না। সিনেমায় এই যে ইসলাম স্তুতি এতে সমাজের সর্বনাশ যা হবার তা তো হচ্ছেই, যারা এই কাজের হোতা তারাও কিন্তু নিজেদের বাঁচাতে পারছে না। যে সমাজকে ইসলাম গ্রাস করতে চায় তাদের লক্ষ্য থাকে তিনটে জিনিস। কালচার-এগ্রিকালচার এবং নারী। সংস্কৃতিতে ধ্বংস করো, জমি যত পারো কিনে নাও, আর নারীদের নিয়ে এসো নিজেদের সমাজে। এটা পারলে সে দেশের মাজা ভেঙে দিতে বিলম্ব হবে না।

শিক্ষিত মুসলমানেরা বোধহয় প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা স্বধর্মী মেয়েদের বিবাহ করবে না। আমলা থেকে রাজনৈতিক নেতা, কংগ্রেস থেকে নকশাল, অধ্যাপক শিল্পী সাহিত্যিক গায়ক অভিনেতা সব বুদ্ধিজীবী মুসলমানের লক্ষ্য হিন্দুনারী। অর্জ্জুনের পাখীর চোখ তীরবিদ্ধ করার মতো তাদের লক্ষ্য শিক্ষিতা সুন্দরী হিন্দু কন্যা। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ কন্যা। উচ্চবর্ণের শিক্ষিতা মেয়েদের আনতে পারলে বাকীদের আনা সহজ হয়ে যাবে। তাদের দ্বিধা সংকোচ থাকবে না। সিনেমা

নাটকের জগতেও তারা এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজবব্বর বিবাহিত, স্ত্রী বিদ্যমান। তবু ব্রাহ্মণ কন্যা স্মিতা পাতিল নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। তাকে বিয়ে করল। শাহাজানের তীব্র প্রেম যেমন মমতাজকে চতুর্দশ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, রাজবব্বরের প্রেমও তাই। বেশী বয়সে তড়িঘড়ি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল স্মিতা পাতিল।

ইসলামের লক্ষ্য কি জানা না থাকায় হারিয়ে গেল এক প্রবল সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী। গণনাট্য সংঘের নাটক করতে এসে সফদর হাসমি ঠিক গেঁথে ফেলল মালাশ্রী ভট্টাচার্য্যকে। দিব্যা ভারতী চলে গেল সাজিদের ঘরে। কিছু জেনে ফেলার অপরাধে তাকে হত্যা করে সরিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবী থেকে। বাংলার শ্রীলা মজুমদার সাংবাদিক এস এন এম আবদিকে বিয়ে করল। এর আগে চলে গেছে শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলার ছেলে বিয়ে করল হিন্দু নায়িকা অমৃতা সিংকে। শ্রীলার কথা ভবিষৎ বলবে, কারো জীবন কিন্তু সুখের হয়নি। অনেকে সেই অর্থহীন কথাটা আর একবার বললেন শিল্পীর কোনো জাত নেই। তাহলে প্রতিপ্রশ্ন করা যেতে পারে, অতীতে ও বর্তমানে নার্গিস ছাড়া শিল্পীদের প্রেমের স্রোতটি একমুখী কেন? তাও নার্গিসকে তার মৃত্যুপূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী মুসলিম পদ্ধতিতে কবরায়িত করা হয়েছিল। এই লাইনে আর একজন আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দু দে। তাঁর স্ত্রী মুসলমান এবং মার্ক্সবাদী অতএব ডবল প্রগতি। তবু তিনি নিজের মুসলিম নাম পাল্টাতে চাননি। অনেক সংঘর্ষের পর পাল্টেছেন। তাঁর কবরের জন্য জমি কিনে রাখা হয়েছে। এঁরা নাকি ধর্ম মানেন না। অধ্যাপক নিতান্তই পত্নীগত প্রাণ। তাই নতুন গতি মিযান পত্রিকায় হিন্দুর শ্রাদ্ধ করেন। নবীদিবসে দূরদর্শনে ইসলামে সাম্যবাদ গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা কিভাবে বিরাজমান তার ব্যাখ্যা করেন। ৯২ সালের শেষে তাঁর ডাক্তার ভাই অমলেন্দু দে-কে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে সব কেড়ে নিয়ে ঢাকা থেকে ভারতে তাড়িয়ে দিয়েছে। মরমে মরে আছেন অধ্যাপক, কিন্তু কাউকে বলতে পারছেন না।

আবার সিনেমা জগতে ফিরে আসা যাক। শিল্পীর জাত নেই, কথাটা সত্য হলে শাবানা আজমী রীণা রায় ব্যতিক্রম হয়ে গেল কেন? সিনেমা জগতে এদের যোগ্য হিন্দু কেউ ছিল না! শাবানা বিয়ে করল চিত্রনাট্যকার জাভেদকে। শাহবানুর জন্য বিক্ষোভ দেখিয়েছিল শাবানা। বলেছিল, তালাক তুলে দিতে হবে। জাভেদকে সেই উদ্বুদ্ধ করল তার আগের স্ত্রীকে তালাক দিতে। রীণা রায় তো ভারতে বিয়েই করল না। বিয়ে করল পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলোয়াড় মহসীনকে। একটি কন্যা প্রসবের পর রীণাকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে মহসীন বিয়ে করে সৌদি আরবের সাদিয়া মতিন নামে এক রূপবতী এয়ার হোস্টেসকে। এদের ভাবনা-চিন্তা অন্য রকম হওয়ার নানা কারণের মধ্যে একটি সিনেমা নাটকের জগৎ তাদের মানসিকতাকে শিথিল করে দিতে পারেনি। মুসলমান মেয়েদের হিন্দু স্বামী গ্রহণের প্রেরণা কোনো ছবিতে থাকে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয় না। কোনো মুসলমান যেমন বলে না, ধর্ম সবই সমান, তেমনি বলে শিল্পীর কোনো জাত নেই। হিন্দু শিল্পী পণ্ডিত বুদ্ধি জীবীরা এই অর্থহীন কথাগুলি অর্থলোভে বলে থাকে। এর ফলশ্রুতি সমগ্র হিন্দুজাতি ইসলামের সহজলভ্য আহার্য্যে পরিণত হয়। গোটা নাট্যজগৎ ইদুঁরের মতো নীরবে হিন্দুসমাজের শিকড় কেটে দিচ্ছে। শিল্পের নামে সিনেমার নামে প্রচারের আতসবাজীর আড়ালে চলছে বিপুল চক্রান্ত। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে দূরদর্শন।

রামায়ণ মহাভারত সিরিয়াল প্রচারিত হবার পর বিদেশী এজেন্ট বুদ্ধিজীবীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তাদের মনে হলো, এতো হিন্দু সমাজ তাদের আইডেন্টিটি খুঁজে পেয়ে যাবে। হিন্দু পুনরুত্থানে সহায়তা করা হয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়ে উঠলো। তৈরী হলো তামস। যাতে R.S.S-কে দেখানো হলো বিকৃত করে। হাফপ্যান্ট পরে তারা দাঙ্গা করে বেড়াচ্ছে। হিন্দুরা মসজিদে মরাশুয়োর ফেলে রেখে দাঙ্গা বাধাচ্ছে। তামসের লেখক ভীষ্ম সাহানী, পরিচালক গোবিন্দ নিহালনী। দুজনেই সিন্ধু প্রদেশের লোক। মার খেয়ে পালিয়ে আসা

রিফিউজী যাদের হাতে মার খেয়েছিল এখন তাদের পয়সাখাওয়া বুদ্ধিজীবী। এই দুজনকে নিয়ে দেশব্যাপী একটা হৈচে করার চেষ্টা করল দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি। কিন্তু জমল না। আরম্ভ হলো আমীরখসরু মীর্জ্জাগালিব। মহাভারতের জনপ্রিয়তা ঠেকাতে শ্যাম বেনেগালকে দিয়ে নির্মিত হলো ভারত এক খোঁজ, সঞ্জয় খানকে দিয়ে টিপু সুলতান। আঘাতে আঘাতে হিন্দুসমাজ এখন অনেক সচেতন হয়ে গেছে তাই এর কোনোটাই দর্শককে মাতাতে পারেনি। চাণক্য সিরিয়ালটি চলার সময় পাকিস্তানের সাংবাদিকেরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো। তাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হলো ডন, অবজার্ভার পত্রিকায়।

এতদিন লোকে জানত লাল কাপড় দেখলে ষাঁড় খেপে যায়। বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী বুদ্ধিজীবী ষণ্ডেরা গেরুয়া দেখে খেপে গেল। এদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাগুলো ভাবিয়ে তোলে জনপ্রিয়তা এবং প্রচার মাধ্যমের সুযোগে এরা জাতির কতো বড়ো সর্বনাশে উদ্যত। আত্মবিধ্বংসী এই কাজে সংবাদপত্র কুলও পিছিয়ে নেই। বিশেষভাবে আনন্দবাজার ষ্টেট্‌সম্যান ও আজকাল। 'আজকাল' পত্রিকায় বিদ্যমান ত্রিরত্ন। আজিজুল হক, বাহারউদ্দিন এবং হোসেনুর রহমান। তিনজনেই হিন্দুবিরোধী মৌলবাদী মুসলমান। আজিজুল হকের ঝাঁজ একটু বেশী, কারণ তার মধ্যে রাজনৈতিক মৌলবাদ এবং ধর্মীয় মৌলবাদের সমাহার হয়েছে। তাই তার হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অস্ত্র ধরতে ইচ্ছে করে। শরীরটা দুর্বল বলে পারে না। দুঃখ চেপে রেখে কলম বাগিয়ে লিখে যায় হিন্দু এবং হিন্দুসংগঠনগুলির বিরুদ্ধে। লিখতেই পারে কারণ যারা মুসলমান নয় তাদের বিরোধিতা করা ওদের ইতিহাস স্বীকৃত জন্মগত অধিকার। কোরান এই অধিকারকে জাষ্টিফায়েড করে দিয়েছে। বাহারউদ্দিন বেশ বাহার করে লিখতে পারেন। গোলাম আজম আদবানী বি জে পি এবং জামাত কীভাবে পরিকল্পনা মাফিক মিলে মিশে কাজ করে যাচ্ছে। হোসেনুর রহমান একটু স্বতন্ত্র। 'তুই ভালো তোর মামা ভালো নয়' টাইপ। ইসলাম ভালো, কিন্তু সব মুসলমান ভালো নয়,

গোছের লেখা লিখে তিনি আর-এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরী করেন। হিন্দুদের কাছে বেশী উদার প্রমাণিত করার একটি পরীক্ষিত পথ। হিন্দুদের বিরোধিতা করলেও নিজেদের লাইন থেকে সরে আসেনি কেউ। সে লাইন হচ্ছে পৌত্তলিকদের সব খারাপ শুধু মেয়েরা বড়ো ভালো। তিনজনই স্ত্রী সংগ্রহ করেছে হিন্দু বাড়ী থেকে। আজিজুল হক্ হিন্দুনাম নিয়ে যাতায়াত করত একটি বাড়ীতে। সেখান থেকে সংগ্রহ করল মণিদীপা রায়কে। উগ্র মার্ক্সবাদী হয়েও ইসলামিক লাইন থেকে চ্যুত হলো না। বাহার উদ্দিন হিন্দু মেয়েটিকে কালেকশান করেছে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিয়ে হয়েছে কলকাতায় গৌরী আয়ুরের বাড়ীতে। গৌরী আয়ুর ছিলেন গৌরী দত্ত। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অম্লান দত্তের বোন। বিয়ে করেছিলেন আবু সয়ীদ আয়ুবকে। আয়ুব রবীন্দ্র গবেষক। রবীন্দ্রভাবনার ছত্রছায়ায় লালিত তাঁর মানসিকতা। সবাই জানে, তিনি প্রগতিশীল। কিন্তু তিনি তাঁর পত্রিকায় হিন্দুধর্মের যথেষ্ট সমালোচনা করলেও ইসলাম সম্পর্কে ছিলেন নীরব। গৌরী আয়ুর একটি কাগজে লিখেছেন ঃ আমি ষোল বছর বয়সে ধর্ম হারিয়েছি। তখন ৪৭ সাল দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মধ্যরাতে আল্লাহো আকবর আর জয় বজরঙ্গবলী আওয়াজ শুনতে শুনতে ধার্মিক মানুষদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জন্মাতে শুরু করে। তা করুক, তাতে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে কেন? তাছাড়া কলকাতায় ৪৭ সালে আল্লাহো আকবর হুংকারের পরিবর্তে শ্লোগান ছিল বন্দে মাতরম। জয় বজরঙ্গবলী কেউ বলেনি। এই উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যে কথাগুলি বাদ দিয়েও বোঝা যায়, এদের চক্রটি কত বড়ো, আর কতখানি সক্রিয়। হাইলাকান্দির ছেলে গৌহাটির মেয়ে নিয়ে চলে এলো কলকাতা গৌরী আয়ুবের বাড়ী বিয়ে করতে। হোসেনুর রহমান তিনি বাড়ীতে তুললেন পূর্ণিমা রুদ্রকে। একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে ঃ পূর্ণিমাকে বিয়ে করে হোসেনুর শুদ্ধ বাংলায় কাটা কাটা ভাবে শ্বশুরমশাইকে টেলিফোনে বলেন, আজ আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি, শুনেই তিনি ফোন ছুঁড়ে ফেলে দেন। পনের ষোলো দিন

পরে তিনি নিমন্ত্রণ পান শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে হোসেনুরকে দেখে শাশুড়ী নাকি বলেছিলেন আহা চৈতন্যের মতো জামাই আমার, তবে মুসলমান না হলে ভাল হতো।

বিখ্যাত সালু চৌধুরী যিনি সস্ত্রীক গাড়ী চালিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নাম তুলেছেন তিনি বিয়ে করেছেন হিন্দু মেয়ে নীনাকে। সালু বলেন আমি একজন খাঁটি মুসলমান। আমার গর্ব যে আমি একজন সেরা হিন্দু নারীর স্বামী। খাঁটি মুসলমান মানে কি? বুদ্ধিজীবীরা না জানলেও এখন বহু মানুষ জানে। তাহলে আত্মনাশ করলো কে? হিন্দু মেয়েটি। চয়ন ইসলাম বিবাহ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী লিলি গাঙ্গুলীকে। এখন লিলি ইসলাম। চয়নের বাড়ী বাংলাদেশে। লিলির বক্তব্য আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা খুব আধুনিক মনস্ক। বরং বাধা পেয়েছিলাম আমার বাড়ী থেকে। আধুনিক মনস্ক শ্বশুরবাড়ীতে লিলিকে ধর্মান্তরিত হয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে নয়। আসলে হিন্দু মেয়েরা সাহিত্য সিনেমা গল্প উপন্যাসে দিবারাত্র ধর্ম সবই সমান আর মুসলমানদের প্রশংসা শুনে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর মুসলিম যুবকেরা ধর্মীয় কারণেই প্রগতিশীল সেজে হিন্দু মেয়েদের ওৎ পেতে থাকে। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কমলা বক্তৃতামালায় বলেছিলেন ঃ কাফেরের মেয়ে শাদী করলে এন্তেকালের পর বেহেস্তের চিরবসন্তময় রাজ্যে যৌবনবতী হুরীদের নিয়ে সুরা সেবন করে আনন্দে থাকা যায়। এখন এসব কাজের জন্য টাকা আসে, তাই সব দিক থেকে লাভ। লোকসানের পালা শুধু হতভাগিনী হিন্দু মেয়েগুলির। তাদের খাদ্যরুচি আহত হয় প্রতিদিন। স্বাধীনতা খর্ব হয় প্রতি পদে। তালাকের ভয়ে থাকে তটস্থ। ফলে এক অসুখী প্রবঞ্চনাময় জীবন কাটিয়ে যেতে হয় তাদের। ঠকে গিয়েও তারা কাউকে বলতে পারে না। আমরা ঠকে যাইনি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে এরা বলে নিজের ধর্ম স্বীকার করে নিয়েও পরের ধর্মে শ্রদ্ধাশীল থাকা যায়। আমরা তো ভালোই আছি। এতে

অন্যরা উৎসাহিত হয়। ব্যারিস্টার সাধন গুপ্তের মেয়ে চান্দ্রেয়ী চলে গেল বাদশা আলমের সঙ্গে। আইনজ্ঞ অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহ করলেন। পাত্রী মুসলীম মহিলা। অরুণবাবু ধর্মান্তরিত হলেন। এখন তাঁর নাম মহম্মদ এ পি চ্যাটার্জী। কোনো ধর্মে এঁদের আস্থা নেই একথা এরা সারা জীবন বলে এসেছেন। এঁরা কমিউনিষ্ট। ইসলামকে এঁরা ধর্মের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন। অন্যদের একথা বোঝাবার চেষ্টা করেন।

ইসলাম দেশের হিন্দু বুদ্ধিজীবী ব্যবহারজীবীদের মধ্যে দিয়ে তার নিশ্চিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর পত্রে লিখেছেন ঃ "মুসলমান যেখানে আসে সে সন্ততি বৃদ্ধির দ্বারা ধারাবাহিকভাবে আপন ধর্ম বিস্তার করে"। সংগ্রহ করে অন্য ধর্মের নারী। তাদের সমাজে দায়দায়িত্ব বন্ধন প্রায় নেই। সেক্স ফ্রী। বাংলাদেশে বৌ ছেলে আজ এখানে এসে সংসার পেতে বসেছে এমন মুসলমান আকছার দেখা যায়। বাংলাদেশে চলে গেলে এগুলোকে ফেলে রেখে যাবে। বিস্তার ঘটবে না কেন? এগুলো সমাজকে জানতে দেয় না সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা। মুসলিম লেখকেরা এদিক দিয়ে এককাঠি ওপরে। সৈয়দ মুজতবা আলি বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ। তিনি তাঁর রচনায় একাধিকবার হিন্দু বন্ধুকে গরুর মাংস খাইয়ে আনার গল্প করেছেন। শুয়োর খাবার কথা বলতে হবে না। খুব প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মুসলমানকে এক কোপে কাটা পাঁঠার মাংস খাবার প্রস্তাব করে দেখুন না কি হয়! এ পরীক্ষা তো যে কোনো দিন যে কোনো স্থানে হতে পারে।

আব্দুল জব্বার কাগজে ফিচার লিখতে গিয়েও ভবী ভোলে না। লেখে, কবি বন্দে আলী মিঞার বাড়ী গেলাম। তাঁর মেজো ছেলের বৌ মোচার চপ তৈরী করেন চমৎকার। ব্যানার্জীবাড়ীর মেয়ে তো! মনে করিয়ে দেওয়া হলো। বামুনের মেয়ে মুসলমানের বাড়ী এসেছে। তালাকের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে লেখে ঃ মুসলমানেরা তালাক দেয় হিন্দুরা বৌ পোড়ায় কোন্‌টা বেশী খারাপ?

একটি বইয়ে লিখেছে শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িক এবং বাস্তববুদ্ধি শূন্য লেখক। কোন্ মুসলমান তার গরুর নাম কক্ষনো মহেশ রাখে না। এসব আব্দুল জব্বারের মুখে সাজে। কারণ সে মুসলমান। কিন্তু প্রফুল্ল সরকারের আনন্দবাজার করছেটা কি? প্রয়াত প্রফুল্ল সরকার পরাধীন ভারতে হিন্দুদের চৈতন্য ফেরাতে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু নামে একটা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এখন নিন্দুকেরা আনন্দবাজারকে বলে আরব টাইমস্। ইসলাম প্রচারের আর হিন্দু দলনের মুখপত্র। তারা আরো বলে, বর্তমান ভারতের জিঞ্জার জিন্না সৈয়দ শাহাবুদ্দিনকে তুলে ধরছে ষ্টেটস্‌ম্যান। আর আনন্দবাজার পুষছে মডারেট জিন্না মোবাশার জাভেদ আকবরকে।

পুরো আনন্দবাজার গ্রূপের ইসলামকে গার্ড দেবার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখলে মায়া হয়। নির্বোধের মতো যুক্তিবর্জ্জিত হিন্দু বিরোধিতা বি জে পি-র বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো দেখে ঘৃণা হয়। বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে লেখানো হয়, রাম কল্পনা, বাবর ঐতিহাসিক পুরুষ। ভারতের সভ্যতাটা হচ্ছে ইসলামের অবদান। হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্ম নেই। হিন্দু মানেই ফ্যাসিষ্ট। হিন্দুত্ব মানে ফ্যাসিবাদ। বর্বরতা স্বৈরতন্ত্র। ইসলাম উদার অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী জীবনদর্শন। ভারতের সব মুসলমান বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের ফসল। ভালো অর্থ পেলে কতো খারাপ লেখা যায় আনন্দবাজার তার নজীর। এখন অবশ্য তাদের সব রচনাতেই বিষাদসিন্ধু, হতাশা। হিন্দুদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা ঠিক কোমর বেঁধে লাগতে পারছে না। তা বলে তারা হাল ছাড়েনি। "হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ্য শোষণ" "বৌদ্ধরা কি হিন্দু নয়" শিরোনামে একগুচ্ছ চিঠি ছাপা হলো। হিন্দু সমাজে একটা সংঘাত লাগানোর উদ্দেশ্যে।

মুসলমানদের জন্য এরা সব কিছু করতে পারে। লোকে যে এই কাগজটি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে সেটা তো অকারণে নয়। রশিদের জীবনকাহিনী তার সঙ্গে সি পি এম সংগ্রেসের নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে "বর্তমান" যখন

তোলপাড় করে দিচ্ছে আনন্দবাজার তখন প্রায় নীরব। নানা সন্দেহে জনগণ যখন পীড়িত তখন হাসির খোরাক জুগিয়ে দিলেন জ্যোতি বসু। যে বর্তমান পত্রিকা জ্যোতিবাবুকে উলঙ্গ রাজা করে ছেড়েছে। বরুণ সেনগুপ্ত যাঁকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাদের সব অপমান হজম করে তিনি মানহানির মামলা করলেন আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে। রশিদের সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে বলে। অথচ এই পত্রিকাটি বাম সরকারের অনুগ্রহভাজন। না চাইতে লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন পায়, ফলে এরা সি পি এম বিরোধী লেখাগুলি সতর্কতার সঙ্গে লেখে। বিরুদ্ধে কিন্তু নেগেটিভ্ এবং বন্ধ্যা। ৯২-এর মার্চ মাসে প্রেস ক্লাবের বি জে পি সভাপতি মুরলী মনোহর যোশীর সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছিল। আনন্দবাজারের সাংবাদিকেরা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছিল। তারা বলল ঃ অযোধ্যায় আপনাদের লোকেরা সাংবাদিকদের নিগ্রহ করল কেন? যোশী বললেন ঃ এর জন্য আমরা দুঃখিত, নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। আবার ক্ষমা চাইছি। এবার বলুন সি পি এম সরকার যে মহাকরণে আপনাদের পেটালো তার জন্য কি করেছেন? ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলল ঃ তাতে আপনার কি? ওটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। মুরলী মনোহর সেদিন ছাদ ফাটানো হাসি হেসেছিলেন। এখন জনগণ মুচকি হাসছে। এসবের অর্থ জ্যোতিবাবু আনন্দবাজার রশিদ খান সব এক ঝাঁকের কই। বৌবাজার বিস্ফোরণের পর পত্রিকা জগতে ইদুঁর দৌড়ে অনেক পিছিয়ে পড়ল অনন্দবাজার। আর সব মানমর্য্যাদা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জ্যোতিবাবুর। দুপক্ষের মান বাঁচানোর জন্য হলো মানহানির মামলা।

প্রভুভক্ত আনন্দবাজারের আরো কিছু প্রমাণ দাখিল করা যাক। সোমবার দ্বিতীয় পাতায় থাকে বাজার দর। লেখে বাজার সরকার। একদিন বাজার দর পড়ে রইলো শুরু হলো আরব্য কাহিনী। হেডলাইন হয়ে গেল "রামমোহন, বিবেকানন্দ এবং ক্ষুদিরামের আসল দিদি।" রামমোহন ছিলেন এমন একজন মানুষ যাকে হিন্দুরা মনে করত হিন্দু, মুসলমানেরা মনে করত মুসলমান, খ্রীষ্টানেরা

মনে করত খ্রীষ্টান। বিবেকানন্দের চিকাগো যাত্রা সম্ভব হতো না যদি মুসলমানেরা আর্থিক সাহায্য না দিত। ক্ষুদিরাম ফাঁসীর আগে একবার তার দিদিকে দেখতে চেয়েছিল। স্বামীর চাকরী যাবার ভয়ে দিদি যায়নি। মেদিনীপুর থেকে ছুটে গিয়েছিল মজঃফরপুর, এক মুসলমান মহিলা। যাকে ক্ষুদিরাম দু-একদিন দিদি বলে ডেকেছিল।" দেশের গবেষকরা যা জানেন না তা জানে বাজার সরকার। রামমোহনকে এক ফাদার ভালো চাকরীর বিনিময়ে খ্রীষ্টান হবার প্রস্তাব দিয়েছিল। রামমোহন তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি হিন্দু থেকেই মরতে চাই। বিবেকানন্দ মাদ্রাজের হিন্দু ছেলেদের সাহায্যে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ক্ষুদিরামের কোনো মুসলিম দিদি ছিল না। তবু এসব লেখা হচ্ছে এবং হবে। বিদেশী অর্থের কৌলিন্যে প্রবন্ধের গরু সোজা নারকেল কাছে উঠে যাবে। উঠে থেকে যাবে।

শুধু তথ্য বিকৃতি নয়, ভাষাতেও এদের কোনো সংযম নেই। একজন সাংবাদিক নবদ্বীপে গিয়ে ইস্কনের মন্দিরে কীর্তন সহকারে নৃত্য দেখে এসে আনন্দবাজারে লিখলেন ঃ পঁয়ত্রিশ বছরের এক সুঠাম বিদেশিনী ভক্তি ভরে দুহাত তুলে যখন নামগান করছিলেন দেখলাম তার ব্লাউজের বগলের দিকটা বেশ ছেঁড়া এবং তার অন্তর্বাস ছিল না। স্যানিটারী ইন্সপেক্টর হিসাবে যাদের বাথরুম ল্যাট্রিন পরীক্ষা করার কথা তারা সাংবাদিক হলে এমন লেখাই হবে। কাগজের পলিসি এ্যান্টি হিন্দু হলে এ লেখা ছাপতেও অসুবিধে নেই। একজন সাংসদ তার ওপর মহিলা সন্ন্যাসিনি উমা ভারতী সম্পর্কে এদের বিশেষণ সেক্সি সন্ন্যাসিনি। এই কামার্ত পশুগুলি এদেশে বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক। উত্তর ভারতের কোটি কোটি মানুষের আবাসস্থল এদের দৃষ্টিতে গোবলয় কাউবেল্ট। যেহেতু এখানে হিন্দুজাগরণ সর্বাধিক তাই এরা নির্বোধ এবং গোবলয়ের মানুষ। এরা বুদ্ধিজীবী নয়, বৌদ্ধিক জগতের মাফিয়া। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হলে এদের আচরণ প্রকাশভঙ্গি হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন। যথার্থ বুদ্ধিজীবী তাঁরাই যাঁরা তাঁদের

অর্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানকে পদ ও প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র ভাবেন না। সদুপায়লব্ধ প্রতিষ্ঠাকেও যাঁরা জ্ঞান আর বিশ্বাসের কাছে খাঁটি থাকার জন্য মুহূর্তে পদাঘাত করতে পারেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন বিধাতা মস্তিষ্ক দিয়েছেন রাজশক্তির অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে পদোন্নতির সাধনা করার জন্য নয়। তাঁরা যেমন কোনো রাজনৈতিক মতবাদে আচ্ছন্ন হবেন না বিদেশের ভাবদাস। প্রগতিশীল হবার তাৎক্ষণিক মোহে তাঁরা স্বদেশ আত্মাকে অপমান করবেন না। তাঁদের পূজ্য হবে স্বদেশের মহান সংস্কৃতি। আনুগত্য থাকবে সত্য শুধুমাত্র সত্যের প্রতি। তাঁদের প্রতিজ্ঞা হবে ঃ "সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা"। এঁরা পথ দেখাবেন অন্ধকারে। ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল। আমরা বলে থাকি। বুদ্ধির সঙ্গে শুদ্ধি কথাটা অকারণে ব্যবহার হয় না। শুধু বুদ্ধি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। তাই তার মার্জ্জনা চাই, শুদ্ধি চাই। এদেশের বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশটা অবশ্যই বুদ্ধিমান কিন্তু শুদ্ধিমান নন বলেই বিপথগামী। তাই জীবনে এবং সৃষ্টিতে ঃ 'পুঞ্জপুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে, চতুর্দ্দিকে মিথ্যা, মিথ্যা ব্যবহারে'।

তার আরও একটু বিবরণ। আনন্দবাজার সিন্ডিকেট মাঝে মাঝে জনপ্রিয় লেখকদের ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়ে আনে। উদ্দেশ্য তাদের মিষ্টি কলম দিয়ে আকর্ষণীয় লেখা লিখিয়ে পাঠকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা এবং সঙ্গে চিত্ত বিনোদন। শংকর-সুনীল-শক্তি-দিব্যেন্দু-নীরের-সঞ্জীব-শীর্ষেন্দু-সমরেশ-তারাপদ এরা সবাই আছেন এর মধ্যে। এদের সবাই মদ্যপ এবং নারী বিলাসী নন। অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য আছেন, আছেন রামকৃষ্ণের ভক্ত। তাদের সবার পরিবেশিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি? ঝাঁ চক্‌চকে বিশাল বাড়ী। সিটে গা ডোবানো আরামের বড়ো বড়ো গাড়ী ক্যাসিনো আর মদের দোকান। আর মাঝে মাঝেই কি সুন্দর যৌবনবতী স্বল্পবসনা মেয়েগুলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভোগ, ভোগ্যপণ্য আর প্রাচুর্য্যের বিবরণ। এ তো মানুষকে অশান্ত করে তার মূল্যবোধ

ভেঙে তাকে ভোগস্পৃহ করে তোলা। গতি প্রাচুর্য্য আর ভোগ অন্ততঃ ভারতীয় সভ্যতার মাপকাঠি নয়। তাহলে এদেশের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ঠাঁই হতো না। দেওয়াল জুড়ে ছবি থাকতো রামকৃষ্ণ ডালমিয়া, জি ডি বিড়লা, হর্ষদ মেহতাদের। আমেরিকান লাইফ ষ্টাইলের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি কিন্তু কোনো লেখক লেখেন না। মোহভঙ্গ হয়ে যাবে বলে। নিউইয়র্কের টমাস জেফারসন স্কুলে গত চার বছরে সত্তর জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ কিংবা ছুরিকাহত হয়ে নিহত হয়, কিংবা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। ষ্টেট্ এসেম্বলীর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ ওই স্কুলের উনিশশো ছাত্রের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ ছাত্রের শরীরে কোনো না কোনো প্রকারের ক্ষতচিহ্ন আছে। এই স্কুলে একটি সমাধি তহবিল আছে। ভুক্তভোগী পরিবারগুলিকে কবরের খরচ দিয়ে সাহায্য করার জন্য। বিরানব্বই সালের টাইম পত্রিকায় ৯ই মার্চ এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে আরও প্রকাশ পেয়েছে ঃ গত চার বছরে নরহত্যার অপরাধে কিশোর-কিশোরীদের গ্রেফতারের সংখ্যা তিরানব্বই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউইয়র্কের স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের মারামারি ঠেকাতে ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। মেটাল ডিক্টেটার পাহারাদার রেখেও খুনাখুনি আটকানো যাচ্ছে না। বিদেশ ভ্রমণে বিরতিহীন বিলাসবহুল বিবরণের পাশে এই অন্ধকার দিকগুলো নিরুল্লেখ কেন? স্বল্পবসনা যুবতী চোখে পড়ে, নগ্ন সমাজটি চোখ এড়িয়ে যায় কি করে? পৃথিবীর সাতটি রাষ্ট্রে এখনও কিশোর অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। ইরাক, ইরান, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। আর সুসভ্য আমেরিকা। স্বাধীনতার বল্গাহীন অধিকারের নামে স্বেচ্ছাচার। ভোগের নামে বিকার। লিভ টুগেদার অথবা থুথু ফেলার মতো যৌনবিহার বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ। শরীরী সুখের পথে যেন কোনো বাধা বাধা না থাকে। স্নেহহীন সন্তানেরা স্কুলে গিয়ে খুন করবে সহপাঠীকে। কারো মনের দিগন্তে থাকবে না কোনো কোমল আশ্রয়। স্নিগ্ধ স্নেহ ভালবাসার প্রত্যাশা। বৃদ্ধ হলে আছে পিঁজরাপোল বৃদ্ধাশ্রম।

আনন্দবাজার প্রেরিত কোনো সাহিত্যিকের ভ্রমণ কাহিনীতে এ জীবনের ভগ্নাংশও ধরা পড়ে না। কারণ এরা হিন্দু সংস্কৃতির শুভ্র মূল্যবোধটিকে চূর্ণ করার খেলায় মত্ত। কলম নাকি তলোয়ারের অপেক্ষা শক্তিশালী। আনন্দবাজার তাই শক্তিমান লেখকদের কলম দিয়ে ভারতবর্ষকে বিনষ্ট করতে চায়। কিন্তু তা হবার নয়। ভারতবর্ষ দেশটা অনেকটা মনুষ্য দেহের মতো। শরীরের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। যে কোনো ভাবে তা বহিষ্কৃত হবেই। ভারতবর্ষের দেহেও কোনো ফরেন জিনিস বেশী দিন থাকতে পারে না। প্রফুল্ল সরকার যে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুদের কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিলেন কালের অমোঘ প্রভাবে তারা আজ জয়িষ্ণু। তারা আজ ভাবতে শিখেছে ঈশ্বর তাদের চোখ দিয়েছেন ঠুলি পরে থাকার জন্য নয়। মুখ দিয়েছেন সংবাদপত্র সাংবাদিক পরান্নভোজী প্যারাসাইট বুদ্ধিজীবীদের মুখে ঝাল খাবার জন্য নয়। জনগণ জাগ্রত হচ্ছে যথার্থ বুদ্ধিজীবীরা ভেসে উঠেছেন ধীরে ধীরে। অরুণ শৌরী, পবিত্র ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষাল মানুষের প্রাণের কথা লিখেছেন। ক্ষুব্ধ হয়ে স্বপন দাশগুপ্ত টেলিগ্রাফ ছেড়ে চলে গেলেন টাইমস্ অফ ইন্ডিয়াতে। সুনীতা ঘোষ শেষ পর্য্যন্ত আনন্দবাজারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। গ্রামবাংলার ক্ষুব্ধ বলরাম হলধর পটল ঢাউস পত্রিকা থেকে সরে থাকলেও পরিস্থিতি থেকে সরে আসেননি। সত্যের জন্য হিন্দুত্বের জন্য তাঁর লড়াই জারী আছে। বরুণ সেনগুপ্ত একটু ভিন্ন ক্ষেত্র হলেও নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। পাগলে নিজের ভাল বোঝে। হিন্দুরা বোঝেনি বলেই তার জাতীয় বৃক্ষে এতো আলোকলতা। বৃক্ষের রসে এরা জীবিত থাকে, কিন্তু শিকড়ের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখে না। এখন সমাজ অনেকটা জাগ্রত, তাই আপরুডেট্দের শেষ রজনী আসন্ন। এদেশে কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-গায়িকা অভিনেতা-অভিনেত্রী নাট্যকার সাংবাদিক অধ্যাপক, এদের পেশার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উন্মার্গগামী রাজনৈতিক রস মিক্সচার করে দিলেই হয়ে যায় বুদ্ধি জীবী। একালের এক নতুন প্রজাতি। যথার্থ

অর্থে অর্দ্ধশিক্ষিত এই বুদ্ধিজীবীরা প্রায় অশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতাদের লেজুড়বৃত্তি করে জীবন কাটায়।

এরা দীর্ঘকাল ধরে সমাজতন্ত্রের শবসাধনা করে দারিদ্রের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়ে দেশকে দেউলিয়া এবং বিদেশী ঋণে জর্জরিত করে দিয়েছে। ভিন্ন চিন্তার প্রকাশ দেখলে যূথবদ্ধভাবে পুঁজিবাদের দালাল বলে থাবা মেরে তাকে থামিয়ে দিয়েছে। রাশিয়া এবং চীন যাবার ধূম লেগে গিয়েছিল তখন বুদ্ধিজীবীদের। বিপ্লব এবং সাম্যবাদের তখন তারা সোল সেলিং এজেন্ট। ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা। মার্ক্সবাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই তাদের ছিল না। বিনা খরচে ভ্রমণ এবং নানা উপহারে মুখ বন্ধ ছিল। অথচ রাশিয়াতে তখন প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিবাদ করছেন বুদ্ধিজীবীরা। আইগর সাফারোভিচ বলেছেন ঃ সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের আর্তি হচ্ছে এক ধরনের মৃত্যু ইচ্ছা। ডষ্টয়ভস্কি তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন ঃ তোমাদের সাম্যবাদ কেমন জানো? সকলে যদি সেসারো না হতে পারে তাহলে সেসারোর জীভটা কেটে দাও। সকলে যদি কোপারনিকাস না হতে পারে তাহলে কোপারনিকাসের চোখ দুটো উপড়ে ফেল। সেক্সপীয়ারের মতো প্রতিভাধর যদি সকলে নাই হলো তো সেক্সপীয়ারকে পাথরের আঘাতে হত্যা করো। এটা হচ্ছে তোমাদের সাম্যবাদ। লর্ড এ্যাকটন দূর থেকে বলেছেন ঃ এই সাম্যবাদী কল্পব্যবস্থা এক ধরনের দাস রাজত্ব। ভারতকে দাস এবং ভিক্ষুকদের দেশে পরিণত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের শ্রম কি কম অপচিত হয়েছে! এক সর্বনাশে এদের তৃপ্তি হয়নি, তাই তারা আর-এক সর্বনাশের দিকে ধাবমান। অতএব ঘৃণা ধিক্কার এবং নির্দ্দয়তা এদের অর্জ্জিত অধিকার।

অক্সফোর্ডের বিতর্কিত নীরদ সি চৌধুরী চার দশক আগে এই বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে লিখেছিলেন ঃ জাতীয় জীবনের উত্থান গৌরবের জন্য যোগ্য নেতৃত্বের যেমন দরকার তেমনি দরকার হয় তার ধ্বংস ও পচনের জন্য। এ প্রসঙ্গে

বিখ্যাত তারিক আলিকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "CAN PAKISTAN SERVIVE" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ ১৯৬০ সালে জামাতে উলামায়ে হিন্দ্-এর এক নেতা বলেছিলেন, ভারতে হিন্দু নেতা আর বিদ্বানদের যা অবস্থা তাতে ওরাই এটাকে মুসলিম রাষ্ট্র বানিয়ে দেবে। আমাদের বিশেষ চেষ্টা না করলেও হবে। সব কথাগুলির যোগফল কী? সর্বনাশ, ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন, সত্ত্বার বিলুপ্তি। সবাই জেনে গেছে শুধু যাদের সর্বনাশ তারাই জানে না। তবে যে যাই লিখুন আর বলুন দেশের মানুষ বা বুদ্ধিজীবীদের বিচ্যুতির একটি অন্যতর গভীর কারণ রয়েছে। সাহিত্যিক কবি নাট্যকার বুদ্ধিজীবী আর কজন? মুষ্টিমেয় হয়েও এরা এতদিন পুষ্টিলাভ করেছিল কাদের সাহায্য এবং সহযোগিতায়? এর উত্তর আছে বাঙালী মানসিকতার মধ্যে। আধুনিক বাঙালীর চরিত্র আছে পরস্পর বিরোধী সত্তার সংঘাত। তার একদিকে চরম নীতিভ্রষ্ট আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা অন্যদিকে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো দূরাগত বৃহৎ আদর্শবাদ। চরিত্রের একদিকে আত্মশ্লাঘা নাস্তিকতা যুক্তিবাদিতা। অন্যদিকে অপত্য অন্ধবিশ্বাসের মাদকতা। মনের এক প্রান্তে জড়বাদী চিন্তার প্রাবল্য। অন্য প্রান্তে ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিকতা মিষ্টিসিজম্, গোপনে গুরুদের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ। ব্যক্তিত্বের এক অংশে হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা অন্য অংশে সাহিত্য কাব্যসঙ্গীতের পোশাকী সমঝদারী। এর ফলে বাঙালী হিন্দুর চৈতন্যজগৎ ভাবে কর্মে সর্বত্র পঙ্গু এবং বিকৃত। বাঙালী মনের আত্যন্তিক অসংহতির চূড়ান্ত ফল হলো এই তার নিজেরই বিবদমান সত্তার মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। এক তরল ভাবরাজ্যে সংহার বিলাসিতা। নিজের ছায়ার সঙ্গে বৃদ্ধ করতে করতে সে কায়াকেই হনন করে। আবার সেই উচ্চারণ করে 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' সমস্যা একটিই কায়ার সামগ্রিক স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ে না।

ইসলাম, ইংরেজী শিক্ষা, মার্ক্সবাদ সব শেষে সেকুলারিজম তার ব্যক্তিত্বকে বিচূর্ণিত করেছে। তার চিন্তাজগৎকে করেছে দীন এবং শূন্যবাদী। ভিখারীর শূন্য

ঝুলিতে কেউ বেশী ভিক্ষা দিলে দাতার পরিচয় নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে। তাকে না জেনেও তার গুণগান করে। চিন্তার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং স্বপরিচয় হারানোটাই তার সব ব্যাধির মূল। বাঙালী হিন্দু মানসের উত্তমর্ণ অংশ হিসাবে বুদ্ধিজীবীরা যে আজ ইসলামের সেবক হয়ে মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার কারণ এখানেই নিহিত। পরিচয় না জানলে পিতা-পুত্রেও সংঘাত হয়। পিতার হাতে পুত্র মরে। প্রমাণ রামচন্দ্র এবং তাঁর পুত্রদ্বয় লব ও কুশ। সীতা ঠিক সময়ে না এলে একটা বিপজ্জনক কাণ্ড হয়ে যেত। পার্শীবীর রুস্তমের হাতে নিহত হয়েছিল সোহরাব। অনেকদিন পর ভারতবর্ষ তার নিজস্ব পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার আইডেনটিটি। দেশব্যাপী হিন্দু জাগরণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বাঙালী হিন্দুর অস্থির মানসিকতাকে। তবে সে প্রত্যয় খুঁজে পাবে। ফিরে পাবে নিজেকে। স্বপরিচয়ে প্রত্যয়ী হয়ে উঠলেই তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে প্যানইসলামের উচ্ছিষ্টভোজী রাজনৈতিক দলসমূহকে।

শুঁয়োপোকার মতো সভয়ে পরিত্যাগ করবে চাটুকার চপল স্বধর্মদ্রোহী দুর্বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে। এদের পরিত্যাগের লক্ষণ ফুটে উঠেছে সারা ভারতবর্ষে। আগেই বলা হয়েছে, এদের বিশেষ সামাজিক প্রভাব নেই। এদের বাস কল্পনার জগতে। এ আবর্জনা সাফ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এ কাজেও এগিয়ে আসতে হবে একদল যথার্থ বুদ্ধিজীবীকে। তাঁরা এসেছেন, আসছেন। যাঁরা এখনও দূরে রয়েছেন সেই অনাহত, অনাগত খ্যাত-অখ্যাত প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত সকল পণ্ডিত বিদ্বান প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশরক্ষায় অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত হোক। বুদ্ধিজীবী সমীপে এটাই গোটাজাতির অন্তরাত্মার আকুল আকাঙ্ক্ষা।

